রহস্য সমগ্র

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

১. অহংটা এখনও বেশ আছে..... 2
২. চেনা মানুষের মৃত্যুসংবাদ..... 13
৩. বড় চাকরি করার মস্ত অসুবিধে..... 21
৪. শবর দাশগুপ্তর মনটা ভাল ছিল না..... 37
৫. কথাটা বলে দিতে চাই..... 57
৬. মৃত্যুর মুখ থেকে ঘোষাল ফিরল..... 79
৭. আমি রীণা..... 100
৮. শঙ্করবাবু, তেরো তারিখে..... 109
৯. এমনিতেই রাতে ঘুম হয় না শিখার..... 124

১. অহংটা এখনও বেশ আছে

অহং। অহংটা এখনও বেশ আছে। বয়সে একটু স্তিমিত হয়ে এসেছে ঠিকই। সবসময়ে আগের মতো ফণা তুলে দাঁড়ায় না। সংসারের নানা প্রকাশ্য ও চোরা মারে বারবার আহত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও আছে। কে জানে হয়তো অহংকারটুকুই আছে, আর তার কিছু নেই। তার বউ শিখা বলে, এত আমি-আমি করো বলেই আর কারও দিকে তাকিয়ে দেখলে না কখনও। অত অহংকার বলেই ছেলেটা পর হয়ে গেল, জামাই আসা-যাওয়া বন্ধ করল। এখন অহং ধুয়ে জল খাও। এই শিখার সঙ্গে একটা জীবন বনিবনা হল না তার। অন্তত দু'বার তাদের সম্পর্ক স্থায়ীভাবে ভেঙে যাওয়ার মুখে এসেছিল। টিকে আছে বটে। সম্পর্কটা, তবে ওপর ওপর। ভিতরে কোনও টান নেই, সমবেদনা নেই। দুটো মানুষ এক ছাদের তলায় বাস করেন মাত্র।

আজ ওই অহংবোধই তাকে প্ররোচনা দিয়েছিল হঠকারিতার। সন্ধেবেলা রুটিনমতোই সান্ধ্যভ্রমণ সেরে ফিরে দেখলেন, লিফটটা খোলা। দু'জন মিস্ত্রি গোছের লোক খুটখাট করে কিছু সারাচ্ছেটারাচ্ছে।

বাসুদেব জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে হে?

লিফটের ভিতর থেকে মিস্ত্রিদের একজন বলল, সার্ভিসিং হচ্ছে।

কতক্ষণ লাগবে?

দু-তিন ঘণ্টা। আজ নাও হতে পারে।

বাসুদেব চিন্তিত হলেন। তার ফ্ল্যাট আটতলায়। হার্ট ভাল নয়। উচিত হবে কি সিঁড়ি বেয়ে ওঠা। এমন অবস্থায় ইচ্ছে করলে তিনি গরচায় মণিময়ের বাড়ি চলে যেতে পারেন।

মণিময় অনেক দিনের বন্ধু। কিন্তু শিখাকে জানানো দরকার। কীভাবে জানাবেন? তার ফ্ল্যাটে ফোন নেই।

দারোয়ানকে একটু খুঁজলেন বাসুদেব। সে ব্যাটার টিকিও দেখা গেল না। আসলে ফ্ল্যাটবাড়িটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কাজ চলছে। বেশিরভাগ ফ্ল্যাটেই এখনও লোক আসেনি। দশতলার এই বাড়িতে আজ অবধি মাত্র চার-পাঁচটা ফ্ল্যাটে লোক ঢুকেছে। এখনও দারোয়ানদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি। মাত্র একজনকে দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। ফ্ল্যাটের মালিকরা সবাই এসে গেলে কমিটিটমিটি হবে, তারপর পুরোদস্তুর দারোয়ানদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার কথা।

বাসুদেব এদিক ওদিক দারোয়ানটাকে একটু খুঁজে হতাশ হলেন। এ ব্যাটা প্রায় : ময়েই ছুতোনাতায় কোথায় যেন চলে যায়। সিঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আধুনিক ফ্ল্যাটগুলোর তলা তেমন উঁচু হয় না। পারবেন কি? যৌবনে ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাবে ফুটবল এবং ক্রিকেট দুই-ই খেলেছেন। খেলা থেকেই তার জীবনের প্রথম চাকরি। এখনও দেওয়াল আলমারি ভরতি তার খেলার ট্রফি। অহংটা মাথাচাড়া দিল। পারবেন না? তাই কি হয়? মাত্র ছেষট্টি বছর বয়স। এখনও তার সেক্স কার্যকর। এখনও দু'বেলা মাইল দুয়েক করে হাঁটেন। শরীর নিয়ে তার অহংকার আছে। মাস চারেক আগে হার্টের গণ্ডগোল ধরা পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা তেমন দুশ্চিন্তার কিছু নয়। অন্তত তিনি মনে করেন না।

ঢাকুরিয়ার বাড়িটা নিয়ে গণ্ডগোল করছিল ভাইপোরা। আইন বাসুদেবের পক্ষে ছিল বটে, কারণ বাড়িটা তার নামেই। কিন্তু নৈতিক দিকটা তার দুর্বল ছিল। কারণ, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এজমালি সম্পত্তি বেচা টাকা তার বাবা এবং ভাইরা কিছু কিছু পাঠাত। সেই থেকেই বাড়িটার সূত্রপাত। বাবার ইচ্ছে ছিল বড় বাড়ি করে সব ভাই একসঙ্গে থাকবে, যেমন দেশের বাড়িতে ছিল। কথা ছিল বাড়িটা নিজের নামে করলেও বাসুদেব পরে দলিলে অন্যদেরও নাম ঢোকাবেন।

বাসুদেবেরও তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, দেশের বাড়ি থেকে যে টাকা এসেছিল তার চেয়ে বেশি টাকা বাসুদেবের তবিল থেকে বাড়ির পিছনে খরচ হয়েছে। বাবা আর এসে পৌঁছতে পারলেন না, ও দেশেই মারা গেলেন। দাদাদের মধ্যে একজন এলেন। এল ভাইপো-ভাইঝিরা। বাড়িতে এসেই উঠল সবাই। তারপর শুরু হল তাগিদ, বাড়ির ভাগ লিখে দাও।

বাসুদেব সেজদার সামনে হিসেব ফেলে দিয়ে বললেন, আমার আড়াই লাখ টাকা দিয়ে দাও, লিখে দিচ্ছি।

গণ্ডগোলের সূত্রপাত সেখান থেকেই। এত টাকা তিনি খরচ করেছেন এটা কেউ বিশ্বাস করল না! ঝগড়াঝাটি শুরু হল এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটতে লাগল। বাসুদেবের জোর বেশি, কারণ তিনি এখানকার লোক। তিনি হুমকি দেওয়ায় সেজদা রাগ করে ভাড়া বাড়িতে গেলেন। ভাইপোরাও বিদায় নিল। মামলা মোকদ্দমার তোড়জোড় চলতে লাগল। দেশ থেকে বড়দাও কয়েকবার আসা-যাওয়া করতেন। বাসুদেব সাফ জানিয়ে দিলেন আড়াই লাখ টাকা না পেলে তিনি বাড়ির ভাগ কাউবে দেবেন না।

মামলা হলে বাসুদেবের জয় অনিবার্য ছিল। তা ছাড়া এদেশে দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি হতে এত সময় নেয় যে যুবক বুড়ো হয়ে যায়। এক পুরুষে হয়তো নিষ্পত্তি হয়ও না। এসব ভেবেই বোধহয় ওরা আর মামলা করেনি, কিন্তু দাবিও ছাড়েনি। অন্তত দুটি ভাইপো শিবশঙ্কর আর গোপাল নাগরিক কমিটি, রাজনৈতিক দল আর স্থানীয় মস্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রায়ই ঝামেলা পাকাত। বাসুদেব এক বছর আগে বাড়িটা তাই প্রমোটারকে দিয়ে দিলেন। নিয়মমতো প্রমোটার ফ্ল্যাট তৈরি করে সেখানে তাকে ফ্ল্যাট দেবে। কিন্তু বাসুদেব প্রমোটারকে বললেন, আমি এখানে থাকব না, অন্য জায়গায় আমাকে ফ্ল্যাট দিতে হবে। তবে এ বাড়িতেও আমার এক আত্মীয়ের জন্য একটা ফ্ল্যাট চাই।

বালিগঞ্জ ফাড়ির কাছে এই ফ্ল্যাটটা প্রমোটারই তাকে দিয়েছে। পুরনো বাড়িতে ফ্ল্যাট উঠছে শুনে ভাইপোরা ফের একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর ও প্রমোটারের ওপর। ফ্ল্যাটই যখন হচ্ছে তখন আমাদেরও ফ্ল্যাট দিতে হবে। বাসুদেব গায়ে মাখেননি সেসব কথা। শুধু শিখাই মাঝে মাঝে তাকে বলত, এ কাজটা তুমি ভাল করছ না। বাড়ির ভাগ যদি না দিতে পারো, অন্তত ওদের কিছু টাকা ধরে দাও। প্রমোটার তো তোমাকে সাত লাখ টাকাও দিয়েছে।

বাসুদেব একবার যে সিদ্ধান্ত নেন তা থেকে টলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, ওরা আমার সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা না করলে দিতাম। এখন এক পয়সাও দেব না।

তার ভাইপো গোপাল তাকে একবার গুন্ডা দিয়ে মারাবে বলে শাসিয়েছিল। সেটা তিনি ভোলননি।

শিখা বলল, ওদের অভিশাপে আমাদের ভাল হবে না।

তিনি যথারীতি শকুনের শাপ ও গোরুর মৃত্যুর কথা বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পাপ-পুণ্যের ভয় বাসুদেবের নেইও। কারণ ওসব তিনি মানেন না। তিনি মনে করেন জীবনের ক্ষেত্রে একটাই নিয়ম, যার দাঁত নখের জোর বেশি সে-ই টিকে থাকার অধিকারী। তার ভয়-ডর ভাবাবেগ বরাবরই কম। অহংকারী লোকদের ওসব কমই থাকে।

অহংকার কথাটার মানে কী তা বাসুদেব খুব ভাল জানেন না। অহংকার মানে কি নিজেকে ভালবাসা? তা হলে তো সবাই অহংকারী!

তবে কি নিজেকে নিয়ে গৌরববোধ? তাও অল্পবিস্তর সকলেরই আছে। তবে কি অহংকার মানে নিজেকে সর্বদা নির্ভুল এবং অভ্রান্ত মনে করা? নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা? নিজের আরাম-বিলাস-সুখ ছাড়া আর কারও আরাম-বিলাস-সুখের কথা না ভাবা?

যদি এসবই হয়ে থাকে তবে বাসুদেব অহংকারী, সন্দেহ নেই। তিনি কোনওদিনই অন্যের ব্যথা-বেদনা-দুঃখ-অভিমান নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। তার দুই ছেলে এবং মেয়ের নাকি অভিমান আছে যে, বাবা তাদের কখনও ভালবাসেনি। ভালবাসেননি কথাটা ঠিক নয়, তবে ছেলেমেয়ে নিয়ে আদিখ্যেতা তার ছিল না। ওরা বায়না করলে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। ছেলেমেয়েরা তাকে যমের মতো ভয় পেত বরাবর। এখনও হয়তো ঘেন্না করে। কারণ অবিরল ভয় হয়তো কখনও কখনও সমাধান না পেয়ে ঘেন্নায় পর্যবসিত হয়। বাসুদেব ছেলেমেয়ের ঘেন্নার ভাবটা একটু টের পান।

একটা তলা উঠে এলেন বাসুদেব। কোনও অসুবিধে হলনা। আস্তে আস্তে উঠলে অসুবিধে হওয়ার কথাও নয়। উঠতে উঠতে তিনি নিজের প্রবল অহংকারের কথাই ভাবছিলেন। হ্যাঁ, ঠিক বটে, তিনি অহংকারী, কিন্তু ওই অহংকারই কি তাকে বাঁচার জীবনীশক্তিটা জোগান দেয় না? অহংহীন পুরুষ তো নির্বীর্য পুরুষের মতোই। তাই না?

তাঁর খেলোয়াড় জীবনের শেষ দিকে যখন ফর্ম পড়ে যাচ্ছে, যখন দম পান না, যখন ভারী পা আর আগের মতো ডজ বা কারিকুরি দেখাতে পারে না, তখন একটা দুর্মদ অহংকারই তাকে মাঠ ছাড়তে দেয়নি। অনেক গুরুতর খেলায় স্রেফ মনের জোরে তিনি মমতার চেয়ে দশগুণ বেশি দিয়েছেন। টিম থেকে তাকে বাদ দেওয়া হবে– এটা তার সহ্য হওয়ার কথা নয়। একটা সময়ে তিনিই নিজে সরে এলেন। সসম্মানে। খেলার শেষ জীবনে একটা ছেলেকে চিরকালের মতো বসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, সেও ওই অহংকার থেকেই। শুভম মিত্র বলে ছেলেটা তখন লেফট আউটে দারুণ খেলছে। খুব নাম-ডাক। শুভমের দলের সঙ্গে যেদিন খেলা পড়ল, সেদিনকার কথা। বাসুদেব রাইট হাফ-এ। শুভম ছেলেটার পায়ে ছিল হরিণের মতো দৌড়, তেমনি সূক্ষ্ম বল প্লে, তেমনি টার্ন এবং শুটিং। কমপ্লিট প্লেয়ার যাকে বলে। প্রথম হাফে তাকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন বাসুদেব। শুভম তাকে অনায়াসে টুসকি মেরে কাটিয়ে যাচ্ছে, এবং বাসুদেব বলে যে মাঠে কেউ আছে সেটাই যেন মনে রাখছে না। অবহেলাটা সহ্য হচ্ছিল না বাসুদেবের। তিনি বুঝতে পারছিলেন, এরকম চললে সেকেন্ড হাফে তাকে বসানো হবে। তার বদলে নামবে সত্য

রায়। তাই হাফটাইমের কয়েক মিনিট আগে তিনি পা-টা চালালেন-যেমনটা চালালে বিপক্ষের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। শুভম ভাল খেলোয়াড় ছিল ঠিক, কিন্তু এসব অভিজ্ঞতা ছিল না। চোরা পায়ের মার খেয়ে ছিটকে পাঁচ হাত গড়িয়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল। তারপর স্ট্রেচারে শুয়ে হাসপাতাল। শুভমের সেই শেষ খেলা। পায়ের হাড় এমনভাবে ভেঙেছিল যে জীবনে আর মাঠে নামতে পারেনি। এই রাফ ট্যাটি নিয়ে কাগজে বিস্তর লেখালেখি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। বাসুদেব কি অনুতপ্ত হয়েছিলেন? হয়তো একটু হয়েছিল অনুতাপ। কিন্তু অহংকারই তবু বরাবর তাকে চালিয়ে এনেছে।

অহংকারীরা একটু স্বার্থপর হয়েই থাকে। এবং তারা অন্যের সম্পর্কে উদাসীন। শিখা এবং আর কেউ বিশেষ করে শিখা যখন তাকে স্বার্থপর বলে তখন খুব ভুল বলে না।

এই স্বার্থপরতা আর উদাসীনতা কত নির্মম হতে পারে তার উদাহরণ রীণা আর শঙ্কর। স্বামী-স্ত্রী। এই দম্পতিকে তিনি ভাল করে দাম্পত্য জীবন যাপন করতেই দেননি।

যে-কোনও ক্ষেত্রে একটু নাম করলে ভক্ত জোটেই। তারও ভক্ত বড় কম ছিল না। ছেলেদের কথা বাদ রাখলেও মেয়ে-ভক্তেরা ছিল অনেক। তাদের বেশ কয়েকজনের সঙ্গেই তার দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিল। এরকমও হয়েই থাকে। মনে রাখার মানে হয় না। কিন্তু রীণা অন্যরকম।

রীণা ছোটখাটো, রোগা, মুখখানা ভারী মিষ্টি, মায়াবী চোখ দুখানা ছিল গভীর রহস্যে ভরা। নম্র শরীর আর মাজা রং। রীণা যখন তার প্রেমে পড়ে তখন রীণার বিয়ে হয়ে গেছে, বাসুদেব শুধু বিবাহিতই নন, দুই ছেলেমেয়ের বাবাও। কিন্তু তারা দু'জনে এমনভাবে পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেলেন যেন তাদের বয়ঃসন্ধি, দেহ তো ছিলই, দেহ ছাড়িয়েও অনেক দূর গড়াল সম্পর্ক। শঙ্কর এক মস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের সেলস ইঞ্জিনিয়ার। নানা জায়গায় টুর থাকত। কিন্তু তা বলে বাসুদেব যে শঙ্করের অনুপস্থিতির সুযোগ নিতেন তা নয়। বরং রীণার সঙ্গে পরিচয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি

শঙ্করকে মুখের ওপর বলে দিয়েছিলেন, তুমি ওকে ডিভোর্স করো, ওকে আমার চাই। রীণাও স্পষ্টভাবে ডিভোর্স চেয়েছিল শঙ্করের কাছে।

বেচারা শঙ্কর। সে এমনই হদ্দমু ভালবাসত রীণাকে যে প্রস্তাব শুনে প্রথমটায় রেগে গেল। তারপর যখন বুঝল ওদের আটকানোর উপায় নেই, তখন পাগলের মতো হয়ে গেল। তখন সে বাধ্য হয়েই রীণাকে বলেছিল, যা খুশি করো, কিন্তু আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। আমি বাসুদেবদার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক মেনে নিচ্ছি। শুধু কথা দাও, আমাকে ছেড়ে যাবে না।

পৌরুষের এমন অভাব বাসুদেব কদাচিৎ কোনও পুরুষের মধ্যে দেখেছেন। কেউ এরকমভাবে স্ত্রীর জারকে মেনে নিতে পারে? শঙ্করের অহং বলতে কি কিছু ছিল না। শিখা যদি এরকম করত বাসুদেব তো খুন করে ফেলতেন শিখাকে।

বাসুদেব একদিন রীণাকে বলেছিলেন, শঙ্করের তো উচিত ছিল পিস্তল দিয়ে আমাকে খুন করা।

রীণা অবাক হয়ে তার চোখে চোখ রেখে বলেছিল, খুন করবে কেন?

কেন করবে না? ওর পৌরুষ নেই?

পৌরুষ কী জিনিস জানি না। কিন্তু জানি ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে। আমি আঘাত পাই এমন কাজ ও করবে না।

বাসুদেব তত্ত্বটা বোঝেননি। ভালবাসে বলেই তো প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দেবে। না হলে কেমন ভালবাসা?

না, শঙ্কর কখনও আর অস্ফুট প্রতিবাদও করেনি। এমনকী রীণা তার সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছিল, তার প্রথম সন্তানটি হবে বাসুদেবের। শঙ্কর মেনে নেয়। মেড়া আর কাকে বলে?

বাসুদেব আর রীণার সন্তান হল অজাতশত্রু। না, অজাতশত্রু জানে না যে, বাসুদেবই তার বাবা। তার বৈধ বাবা শঙ্কর।

বাসুদেব চারতলায় উঠে দেখলেন, একটি পরিবার, স্বামী স্ত্রী এবং দুটি বাচ্চা লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে সুইচ টেপাটেপি করছে। স্বামী-স্ত্রীর বয়স ত্রিশের কিছু ওপরে।

বাসুদেব বললেন, লিফট খারাপ। সার্ভিসিং হচ্ছে।

তাই নাকি? বলে ভদ্রলোক তাকালেন বাসুদেবের দিকে। তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, চলো তা হলে সিঁড়ি দিয়ে নামি।

কথা বলতে গিয়েই বাসুদেব টের পেলেন, তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে, বড় হাঁফ, জিরোতে হবে।

বাসুদেব জানেন, এ সময়ে হাঁ করে শ্বাস নিতে হয়। তাতে বেশি অক্সিজেন যায় শরীরে। দেয়ালে একটু ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ঘাম হচ্ছে। বরাবরই তিনি খাওয়ার ব্যাপারে কিছু তমোগুণী। ঝাল মশলাদার খাদ্য, বিশেষ করে মাংস তার এখনও প্রিয়। ইদানীং পাঠা খাসি বাদ দিয়ে মুরগি খেতে হচ্ছে ডাক্তারের নির্দেশে। রাত্রিবেলা প্রতি দিনই রুটির সঙ্গে মাংস থাকে। থাকে কাঁচা পেঁয়াজ, লঙ্কা। বেশি মাংস খাওয়াটা কি খারাপ হচ্ছে? ছেষট্টি বছর বয়সের পাকযন্ত্রকে কি অতিরিক্ত খাটাচ্ছেন তিনি। মনে পড়ল, আজ দুপুরে তিনি শুটকি মাছ খেয়েছেন। সেটা বেশ ঝাল আর গরগরে মশলাদার ছিল। খেয়েছেন পাবদা এবং পোনা মাছের আরও দু'রকম পদ। পেটে গ্যাস হয়ে এত ঘাম হচ্ছে নাকি?

মিনিট পাঁচেক নির্জন সিঁড়ির চাতালটায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। আস্তে আস্তে হাঁফ ধরা ভাবটা কমে গেল। কমল, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হল না ফুসফুস। শ্বাসের মৃদু একটু কষ্ট রয়েই গেল। রাতে আজ আর কিছু না খেলেই হল। খেতে তিনি ভালবাসেন। অনেক দিন

আগেই ডাক্তাররা তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল, খাওয়া যেন মাত্রাছাড়া না হয়। মাত্রা একটু আধটু না ছাড়ালে বেঁচে থাকার আনন্দটাই বা কোথায়?

আরও চারটে তলা বাকি। বাসুদেব খুব ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। পারবেন। এর চেয়ে অনেক কঠিন কাজ তো তিনি করেছেন। মাত্র আটতলা উঠতে পারবেন না, তাই কি হয়। বয়স? বয়সটা একটা ধারণা মাত্র। ছেষট্টি বছর বয়সেও তিনি তো এক সক্ষম পুরুষ।

ঠিক কথা, এখন রীণার সঙ্গে তাঁর আর সম্পর্ক নেই। থাকার কথাও নয়। অজাতশত্রুর পর রীণার আরও একটি সন্তান হয়েছে। একটি মেয়ে। নাম পরমা। মেয়েটি শঙ্করের। বছর দশেক আগে এই মেয়েটি জন্মানোর পর থেকেই রীণা সরে যেতে লাগল। বাসুদেবকে ঠিক আগের মতো কাছে টানা বন্ধ করে দিল। একদিন সন্ধেবেলা ব্যালকনিতে পাশাপাশি বসে রীণা বলল, ছেলে আজকাল তোমাকে নিয়ে নানা প্রশ্ন করে। আমার মনে হয় আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ হওয়া দরকার।

বাসুদেবের তাতে খুব একটা আপত্তি হল না। কারণ বেশ দীর্ঘদিনই তিনি রীণাকে ভোগ করেছেন। তবু বললেন, এখনই?

হ্যাঁ। শঙ্করকেও তো কিছু দিতে হবে। অন্তত অর্ধেক জীবনটা। এত ভালবাসে আমাকে ও যে, তোমাকে অবধি মেনে নিয়েছে। এখন ওর এই ত্যাগের মূল্যটা আমাদের দেওয়া উচিত।

বাসুদেবের বয়স তখন মধ্য পঞ্চাশ। ভোগ যথেষ্ট হয়েছে। আপত্তির কারণ ছিল না। তিনি সামান্য একটু অপমানও বোধ করলেন। অহং ফণা তুলেছিল। তিনি উঠে নিঃশব্দেই চলে এলেন। আর কখনও যাননি।

পাঁচতলা পেরোবার আগেই বাসুদেবকে আবার থামতে হল। ফের খাসটায় টান পড়ছে। বড্ড ঘাম। সারা গায়ে কেঁচোর মতো ঘামের ধারা নামছে। পাঞ্জাবির নীচে গেঞ্জি ভিজে যাচ্ছে ঘামে।

বাসুদেব দাঁড়ালেন, হাঁপ ছাড়তে লাগলেন, চোখটায় কি একটু ঘোলাটে দেখছেন?

এবার হাঁপটা সামলাতে বেশ সময় লাগল, ধীরে ধীরে বুকের কষ্টটা কমল বটে, কিন্তু শরীরটা দুর্বল লাগছে। বেশ দুর্বল। পায়ে একটা মৃদু থরথরানি।

কিন্তু আধিব্যাধির অনেকটাই মানসিক ব্যাধির ভয়ই অনেক সময় ব্যাধিকে ডেকে আনে। মনের জোর থাকলে অনেক ব্যাধিকেই ঠেকানো যায়। বাসুদেব পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল আর ঘাড় মুছলেন। রুমালটা ভিজে নেতিয়ে গেল। নিংড়োলে জল পড়বে।

ছ'তলায় এসে বাসুদেব বুকের মাঝখানে ব্যথাটা টের পাচ্ছিলেন। মৃদু কিন্তু নিশ্চিত। বুকে দূরাগত দামামার মতো একটা আওয়াজ।

এবং আচমকাই চোখে একটা অন্ধকার পরদার মতো কিছু ড্রপসিনের মতো পড়েই উঠে গেল। সমস্ত বুদ্ধি, বৃত্তি, যুক্তি, সাহস ভেদ করে একটা ভয় বাসুদেবকে ভালুকের মতো জাপটে ধরল। তার কিছু হচ্ছে? সময় এসে গেল নাকি?

সামনে যে দরজাটা পেলেন তারই ডোরবেল চেপে ধরলেন তিনি। ভিতরে ডিংডং আওয়াজ হল। বারবার বেল টিপলেন তিনি। বারবার আওয়াজ হল। বৃথা। কেউ নেই। প্রতি তলায় তিনটে করে ফ্ল্যাট। তিনটে দরজারই বেল টিপলেন বাসুদেব। তার তেষ্টা পাচ্ছে। তাঁর এখনই শুয়ে পড়া দরকার।

মেঝেতেই শুয়ে পড়বেন কি? ডাক্তার তাকে বলেছিল, হার্ট অ্যাটাক টের পেলেই শুয়ে পড়তে। যখন যে-কোনও অবস্থাতেই শুয়ে পড়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা।

কিন্তু বাসুদেব তা পারলেন না। মেঝেয় শোবেন? বাসুদেব সেনগুপ্ত কি তা পারেন? অহং যে এখনও মরেনি। তিনি অসহায়ের মতো সিঁড়ির চাতালে শুয়ে পড়লে যে লোকে। হাসবে।

ছ'টা তলা পেরিয়ে এসেছেন। সাত পেরিয়ে আটে উঠে যেতে পারলে আর ভাবনা কী?

কিন্তু আরও দুটো তলা যেন এভারেস্টের মতো উঁচু মনে হচ্ছে এখন।

বাসুদেব বারবার চোখে আলো আর অন্ধকার দেখছেন। বুকে মাদল বাজছে। ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হচ্ছে বুকের ব্যথা। বাসুদেব রেলিং আঁকড়ে ধরে দুটো সিঁড়ি ভাঙতেই ককিয়ে উঠলেন ব্যথায়। তার কষে ফেনার মতো কী যেন বুজকুড়ি কাটছে। মাথা টলে যাচ্ছে। হাত ও পা শিথিল আর শীতল হয়ে যাচ্ছে যে! তিনি প্রাণপণে ডাকতে চেষ্টা করলেন, শিখা! শিখা। শিখা...

সিঁড়ি দিয়ে কে নেমে আসছিল। খোলা চোখে চেয়ে ধীরে ধীরে বাসুদেব সিঁড়িতে পড়ে যাচ্ছেন। চেঁচিয়ে বললেন, বাঁচাও....

যে নেমে এল তার মুখটা চিনতে পারলেন বাসুদেব। তার দিকে চেয়ে আছে। বাসুদেব হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। ধরো আমাকে ধরো। সে ধরল না। ধীর পায়ে নেমে গেল পাশ কাটিয়ে। বাসুদেব গড়িয়ে পড়লেন সিঁড়িতে। চোখে যবনিকা নেমে এল।

২. চেনা মানুষের মৃত্যুসংবাদ

চেনা মানুষের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মানেই একটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যাওয়া। যেতে হবে, সময়োচিত শোকজ্ঞাপন করতে হবে। এড়াতে না পারলে শ্মশানবন্ধু হতে হবে। আনঅ্যাভয়েডবল।

বাসুদেব সেনগুপ্তের মৃত্যুসংবাদটা শবর পেল সকালে, কেফাস্টের সময়। বাসুদেব যে তার খুব প্রিয় বা শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন এমন নয়। কিন্তু সম্ভ কটা এড়ানোও যায় না। তার পিসতুতো বোনের শ্বশুর। তা ছাড়া শবর যে ক্লাবে ফুটবল খেলত সেই ক্লাবের একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা। ভালই চেনাজানা ছিল একটা সময়ে।

ব্রেকফাস্টটা পুরোটা খেতে পারল না শবর। উঠে পড়ল। যেতে হবে।

পুলিশ জিপে বেশি সময় লাগল না। লিফটে আটতলায় উঠে দেখল বাসুদেবের ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই রয়েছে। বিস্তর লোক জমা হয়েছে ঘরে। ক্লাবের লোকেরা এসেছে, বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়, আত্মীয়স্বজন তো আছেই। ঘরে থমথমে একটা ভাব। সামনের ঘরেই একটা ডিভানে বাসুদেবকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ফুল, মালা, ধূপকাঠি, বিভিন্ন ক্লাব বা কর্মকর্তাদের দেওয়া ফুলের চাকা ডিভানের গায়ে দাঁড় করানো।

ঘটনাটা দুঃখজনক। ফোনে বাসুদেবের বড় ছেলে বলেছিল, লিফটেনা উঠে বাসুদেব হেঁটে উঠছিলেন। কমজোরি হার্ট ওই পরিশ্রম নিতে পারেনি। সাততলার গোড়াতেই বাসুদেব হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যান। রাত দশটা অবধি কেউ ঘটনাটা টের পায়নি। কারণ ফ্ল্যাটবাড়িটার অধিকাংশই খালি, লোক এখনও আসেনি। দশটাতেও স্বামী না ফেরায় শিখাদেবী বেরিয়ে এসে লিফটে নীচে নামেন। দারোয়ান কিছু বলতে পারেনি। ছ'তলার নন্দীবাবু রাত সাড়ে দশটায় ফিরে বাসুদেবকে দেখতে পান। তিনিই শিখাকে খবর দেন।

ঘরে কান্নাকাটি তেমন কিছু নেই। বাসুদেবের স্ত্রী সোফায় বসে আছেন, দুপাশে দু' জন মহিলা। শিখার মুখখানা থমথমে এই মাত্র। ছেলে অর্কদেব আর বুদ্ধদেব একটু গম্ভীর মাত্র। মেয়ে সুপর্ণা একটা সোফায় বসে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে মাথা নিচু করে আছে।

শবর শিখার কাছেই এগিয়ে গেল।

স্যাড, মাসিমা।

শিখা বিমর্ষ গলায় বলল, কী করে যে হল!

উনি লিফট থাকতে হেঁটে উঠছিলেন কেন?

কী করে বলব? শরীর নিয়ে খুব বড়াই ছিল তো? হয়তো শক্তি পরীক্ষা করতে চাইছিল।

স্ট্রেঞ্জ!

একজন ক্রনিক হার্ট পেশেন্ট লিফট থাকতেও হেঁটে আটতলা উঠতে চাইবে কেন সেটা একটা জরুরি প্রশ্ন। কিন্তু সেটা নিয়ে আর মাথা ঘামানোর মানে হয় না।

একজন বিরলকেশ ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মজবুত চেহারার লোক দরজার কাছাকাছি দাঁড়ানো। লোকটা একটু এগিয়ে এসে বলল, লিফটটা সার্ভিসিং হচ্ছিল বলে উনি হেঁটে উঠছিলেন। আমাদের তো উনিই খবরটা দিলেন যে, লিফটটা সার্ভিসিং হচ্ছে।

শবর বলল, ও।

লোকটা উপযাচক হয়েই বলল, আমরা অবশ্য নীচে নেমে সার্ভিসিং-এর লোকদের দেখতে পাইনি। তবে লিফটের দরজাটা খোলা ছিল।

আপনি কি এ বাড়ির ফ্ল্যাটওনার?

হ্যাঁ। আমি চারতলায় থাকি। ইন ফ্যাক্ট বোধহয় আমরাই ওঁকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখতে পাই। উনি বেশ ঘামছিলেন আর হাফাচ্ছিলেন। আমরা নামবার সময় ওঁর কথাই আলোচনা করছিলাম।

আমরা মানে কারা?

আমি, আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে। আমরা কাল সন্ধেবেলা একটা নেমন্তন্নে যাচ্ছিলাম। লিফটের সামনেই ওঁর সঙ্গে দেখা।

আপনার নাম?

বিরহ মৌলিক।

অর্ক একরকম বন্ধুর মধ্যেই পড়ে। শবরের সঙ্গে অর্কর বেশ ভাব আছে। এর বউ মধুমিতাই তার পিসতুতো বোন। অর্ক এগিয়ে এসে বলল, দারোয়ান কিন্তু বলছে কাল লিফট সার্ভিসিং করতে কারও আসার কথা সে জানে না। বাবা যখন সন্ধেবেলা ফিরেছিল তখন দারোয়ানটা ছিল না, চা খেতে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে লিফটে কাউকে দেখেনি। তবে সেও বলছে, দরজাটা খোলা ছিল দেখে সে বন্ধ করে দেয়। এনি ওয়ে, ব্যাপারটা ডিসগাস্টিং। নতুন লিফট, তার আবার সার্ভিসিং-এর কী দরকার হল বুঝি না।

শবর একটু কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর বলল, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

অর্ক মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, কী আর করা যাবে। তবে লিফট যখন চলছে না তখন বাবা একটু অপেক্ষা করলে পারত। কারণ, ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচতলার মিস্টার সাহা ফিরে আসেন। তিনি লিফটেই উঠেছেন।

শবর ব্যাপারটা তেমন মাথায় নিল না। যদিও তার মাথার ভিতরে কয়েকটা যুক্তি ঠিকমতো পারম্পর্যে আসছিল না, তবু সে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল মন থেকে। এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর মানেই হয় না।

একটু বাদে ঘরে ভিড় আরও বাড়ল। খাটটাট এসে গেছে। নীচে গাড়িও প্রস্তুত। ভিতরের ঘর থেকে মধুমিতা বেরিয়ে এসে শবরকে বলল, টুকুদা, তুমি কি শ্মশানে যাবে?

না রে, আমার কিছু জরুরি কাজ আছে। অনেক লোক দেখছি, আমার কি যাওয়ার দরকার?

না না, কোনও দরকার নেই। আমি ভাবছিলাম, শ্বশুরমশাই তো গেলেন, এরপর কী হবে। শুনছি, ঢাকুরিয়ার ভাশুর আর দেওররা নাকি হাঙ্গামা করতে পারে। তুমি বোধহয় জানো না যে, ঢাকুরিয়ার বাড়িটা থেকে শ্বশুরমশাই আমার খুড়তুতো আর জেঠতুতো দেওর ভাশুরদের বঞ্চিত করেছিলেন।

একটু আধটু শুনেছি। হাঙ্গামা করার কী আছে? দেওয়ানি মামলা, আদালতে ফয়সালা হবে।

মামলা তো হয়নি। তাতে নাকি লাভ নেই।

তা হলে আর হাঙ্গামা করে কী লাভ?

শাশুড়ি তো এই ফ্ল্যাটে একা থাকবেন। উনি ভয় পাচ্ছেন, ওরা এসে হামলা করলে উনি তো কিছু করতে পারবেন না। উনি পুলিশ প্রোটেকশনের কথা বলছিলেন। তুমি কিছু করতে পারবে?

শবর মাথা নেড়ে বলে, এক্ষেত্রে পুলিশ অ্যান্টিসিপেটরি প্রোটেকশন দেয় না। তবে উনি সিকিউরিটি গার্ড রাখতে পারেন। কিন্তু তার দরকারটা কী? এত বড় ফ্ল্যাট, তোর এসে থাকলেই তো পারিস।

না বাবা, আমরা আলাদা আছি আলাদাই ভাল।

তোর দেওর বুদ্ধদেব তো বিয়ে করেনি, তো সে এসে মায়ের সঙ্গে থাকুক। বাস্তবিকই তো, এত বড় ফ্ল্যাটে উনি একা থাকবেন কী করে!

বুদ্ধদেব? তাকে তো চেনো না। আমার কর্তাটি তার বাবাকে পছন্দ করত না ঠিকই, কিন্তু ঘেন্নাও করত না। বুদ্ধদেবের আবার বাবার ওপর এত রাগ যে, বাবা যে বাড়িতে বাস করত সে বাড়িতেও সে বাস করবে না।

বাসুদেব সম্পর্কে শবর খানিকটা জানে। একসময়ে ভাল খেলোয়াড় ছিলেন বটে, কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বোধহয় আদ্যন্ত স্পোর্টসম্যান ছিলেন না। উপরন্তু অসম্ভব দাম্ভিক আর বদমেজাজিও ছিলেন। সে মধুমিতার কাছেই শুনেছে, স্ত্রীর সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল খুব খারাপ। পরিবারের ওপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করতে চাইতেন বলে অর্ক আর বুদ্ধ বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। মেয়ে সুপর্ণাও বাপের বাড়িতে বিশেষ আসে না। কারণ, কী একটা মতবিরোধ হওয়ায় বাসুদেব নাকি জামাই শিবাজীকে জুতোপেটা করার হুমকি দিয়েছিলেন। মেগালোম্যানিয়াকদের সৌজন্যবোধ কমই থাকে। এরা নার্সিসিজমের করুণ শিকার। না পারে অন্যকে আপন করতে, না পারে নিজেকে অন্যের মধ্যে সঞ্চার করতে। ফলে এরা একা হয়ে যায়। বাসুদেবকে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় হচ্ছে। তাকে ঘিরে বেশ জমাট একটা ভিড়।

শবর বলল, তোর শাশুড়ি যাদের ভয় পাচ্ছে তাদের নাম আর ঠিকানা আমাকে একটা কাগজে লিখে দিস। দেখব।

মধুমিতা বলল, সবাই অ্যাগ্রেসিভ নয়। গোপাল বলে একজন আছে সে-ই একটু বেশি ভোকাল। আর শিবশঙ্কর। দু'জনেই আমার সম্পর্কে ভাশুর।

তুই চিনিস ওদের?

চিনি। কয়েকবার দেখেছি।

ভয় দেখাত নাকি?

ও বাবা, খুব ভয় দেখাত। লাশ ফেলে দেওয়ার কথাও বলত। শ্বশুরমশাইকে মুখের ওপরই গোপাল একদিন বলেছিল। শ্বশুরমশাই তেড়ে মারতে গিয়েছিলেন। ওঃ, সে কী কাণ্ড!

শবর একটু হাসল। বলল, এরকম ঘরে ঘরে হয়। অত ভাববার কিছু নেই। আমার মনে হয় না ওরা তোর শাশুড়ির ওপর হামলা টামলা করবে।

তুমি একটু থ্রেট করলে হয়তো ভয় পাবে।

উলটোও হতে পারে। থ্রেট করলে ইগোতে লাগবে। তখন হয়তো অ্যাগ্রেশনের রাস্তা বেছে নেবে। হিউম্যান সাইকোলজি বড় পিকিউলিয়ার।

মধুমিতা ভয় পেয়ে বলল, ও বাবা, তা হলে থাক। সত্যিই তো, ভয় দেখালে আবার উলটো বিপত্তি হতে পারে। গোপাল আবার ভীষণ গুন্ডা টাইপের।

দরজা দিয়ে তিন-চারজন ঢুকতেই মধুমিতা চাপা গলায় বলে উঠল, ও মা! ওই তো ওরা!

শবর নিস্পৃহ চোখে চেয়ে দেখল, গম্ভীর মুখের চারজন যুবক এবং অগ্রভাগে একজন বৃদ্ধ। সে জিজ্ঞেস করল, বুড়ো মানুষটি কে?

জেঠশ্বশুর।

গোপাল কোন জন?

সবুজ টি-শার্ট, মোটা গোঁফ।

গোপাল খুব লম্বা নয়, বেশ তাগড়াই চেহারা, তবে ভুঁড়ি আছে। পুরু ঠোঁট এবং মোটা গোঁফ। চোখে মুখে প্রবল স্মার্টনেস এবং আত্মবিশ্বাসের ছাপ। চারজনের কারও মুখেই

বিশেষ শোক নেই। তবে বুড়ো মানুষটি কাঁদছেন। চোখ লাল। কান্নাটা নকল বলে মনে হল না শবরের।

বৃদ্ধটি তার মৃত ভাইকে কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে আদর বা আশীর্বাদ করলেন। তারপর শিখার কাছে গিয়ে একটু বসলেন পাশের সোফায়। বড় ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল বৃদ্ধকে। শিখার সঙ্গে তার কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল। মৃদু স্বরেই।

শবর বলল, তোর শাশুড়ি বেশ শক্ত ধাতের মানুষ। স্বামী মারা যাওয়ায় ভেঙে পড়েনি তো।

মধুমিতা একটু মুখ বিকৃত করে বলল, দু'জনের সম্পর্ক তো ছিল বিষ। কঁদবে কী, মনে মনে হয়তো খুশিই হয়েছে। যা হাড়-জ্বালানো মানুষ ছিলেন শ্বশুরমশাই, বাব্বাঃ।

বাসুদেবকে নামানো হচ্ছে নীচে। একবার মৃদু হরিধ্বনি সহকারে খাট উঠে গেল কয়েকজনের কাঁধে, শবর লক্ষ করল গোপালও কাধ দিয়েছে। ঘনঘন ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলছিল। দরজার সামনে একটু থমকাল শববাহকেরা। তারপর ভিড়টা বেরিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে বেশ ফাঁকা হয়ে গেল ঘর।

শবর শিখার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

শিখা একদা সুন্দরী ছিলেন, এখনও আছেন। বয়স কম করেও পঞ্চান্নটঞ্চান্ন তো হবেই, বেশিও হতে পারে। কিন্তু এখনও বেশ ছিপছিপে এবং মুখশ্রীতে বার্ধক্যের বলিরেখা বা চামড়ার শিথিলতা নেই। বয়সের অনুপাতে তাকে বেশ কমবয়সিই লাগে।

শিখা মুখ তুলে বললেন, তুমি কি এখনই চলে যাবে?

হ্যাঁ মাসিমা, জরুরি কাজ আছে।

মাঝে মাঝে একটু খোঁজ নিয়ো। বড্ড একা হয়ে গেলাম তো!

বুড়ো মানুষটি শূন্য দৃষ্টিতে বসে ছিলেন। একথা শুনে বললেন, একা কেন বউমা, তোমার তো জনের অভাব নেই।

শিখা যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন।

শবর আর দাঁড়াল না। ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বলল, চলি, মাসিমা। লিফটেই নীচে নেমে এল সে। শববাহকদের আগেই। কারণ ওরা সিঁড়ি বেয়ে নামছে। দেরি হবে। নীচে ফটকের সামনে পাড়ার লোকজনের একটু জটলা, ফুল দিয়ে সাজানো কাঁচের গাড়ি ঘিরে ভিড়।

৩. বড় চাকরি করার মস্ত অসুবিধে

বড় চাকরি করার একটা মস্ত অসুবিধে, ছুটির দিন বলে কিছু নেই। এমনকী শনি রবিবারেও এমন কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা পার্টি থাকে যার সঙ্গে কোম্পানির স্বার্থ জড়িত। আরও একটা অসুবিধে, সব সময়েই যেন কোম্পানির নানা দায়দায়িত্ব ঘাড়ে ভর করে থাকে।

শঙ্কর বসুর এটা তিন নম্বর চাকরি। সেলস ইঞ্জিনিয়ার থেকে এখন রিজিওন্যাল ম্যানেজার। রিচি রোডে মস্ত ফ্ল্যাটে বসবাস। চারটে টেলিফোন। ব্যাঙ্কে মোটামুটি ভদ্রস্থ টাকা জমে যাচ্ছে। ঘরে আধুনিক আসবাবপত্র, গ্যাজেটস এবং ঝি-চাকরের অভাব নেই।

অভাব ব্যাপারটা অবশ্য এইসব বাস্তব সাফল্যের ওপর নির্ভর করে না। অভাব এক ধরনের ধারণা, এক ধরনের অস্থিরতা, হয়তো এক ধরনের ভ্যাকুয়াম।

আজ ছুটির দিন নয়। নটার মধ্যে অফিসে পৌঁছতে হবে। হবেই। সকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে সাড়ে ছ' টা অবধি একটু জগিং ও হাটা শেষ করে বাড়ি ফিরেই দাড়ি কামানো আর স্নানের জন্য পনেরো মিনিট ব্যয় করতে হয়। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে তিনটে খবরের কাগজে চোখ বোলানো। তার পরেই মাপা ব্রেকফাস্ট। সওয়া আটটায় মারুতি এস্টিমে হুস করে বেরিয়ে যাওয়া। তারপর সারাদিন শঙ্কর বসু আর ব্যক্তিগত শঙ্কর বসু নয়। নয় রীণার স্বামী বা পরমার বাবা। সে তখন কেবলই নিকলসনের বড় সাহেব।

আজ সকাল সওয়া সাতটায় শঙ্কর বসুর ব্যস্ত সকাল কিছুটা মন্থর করে দিল খবরের কাগজের একটি ছোট খবর। খবরটা বেরিয়েছে খেলার পাতায়, ডিটেলস বিশেষ নেই। বাসুদেব সেনগুপ্ত বড় খবর হওয়ার মতো লোকও ছিল না। স্কাউড্রেলটা চার দিন আগে

মারা গেছে। হার্ট অ্যাটাক। “তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ...”

গুণমুগ্ধ? গুণমুগ্ধ? শঙ্কর ভ্রু কোঁচকাল। শঙ্করের মুখে খারাপ কথা কদাচিৎ কেউ শুনেছে। তার রুচিবোধ প্রবল। তবু আজ শুয়োরের বাচ্চা কথাটা যেন আপনা থেকেই। তার নিঃশব্দ জিবের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এল। খাসবায়ুর সঙ্গে সেটা শব্দ হয়ে অস্ফুটে উচ্চারিতও হয়ে গেল। সামান্য লজ্জিত হল শঙ্কর।

ঘড়িতে পৌনে আটটা। বেশ দেরিই হয়ে গেছে। আজ ব্রেকফাস্টটা স্কিপ করবে নাকি?

লিভিং রুমের প্রিয় রিক্লাইনিং চেয়ারটি ছেড়ে শঙ্কর উঠে পড়ল। নাউ টু ড্রেস আপ। এই ড্রেস আপে তার কিছু সময় লাগে। এমন নয় যে সে খুব সাজগোজ করে। কিন্তু ভারিক্কি চাকরির কিছু দাবি থাকেই। প্রায় রোজই অফিসের পর কনফারেন্স বা মিটিং বা বড়কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক থাকেই। পোশাকটা সাবধানে না করলে কিছু ভ্রু কুঞ্চিত হয়।

বেশির ভাগ দিনই সুট। আজও তাই। নেভি ব্লুট্রপিক্যাল সুট টাই সহযোগে পরে যখন ডাইনিং হলে ঢুকল তখন আটটা দশ। হঠাৎ আজ তার একটু গরম লাগছে। সে বেয়ারা। রামুকে বলল, এয়ারকুলারটা চালিয়ে দে তো। দুটোই চালা।

দুটো এয়ারকুলারে ঘর ঠান্ডা হচ্ছিল বটে, কিন্তু শঙ্করের মনে হল, এটা ঠিক সেই গরম নয়। বহুদিনকার পুরনো একটা রাগ আর অপমানই ঝটকা মেরেছে আজ। শরীরে মৃদু একটা রি-রি ভাব। রীণার চলাফেরা আজও স্বপ্নের মতো। ওর হাঁটা আজও ভেসে যাওয়ার মতো সাবলীল। রীণার পুতুল পুতুল চেহারা অনেক পালটে গেছে বটে। কিন্তু এখনও রীণাকে ঠিক রিয়েল বলে মনে হয় না শঙ্করের।

রীণা ঘরে এসেই ভ্রু কুঁচকে বলল, এ কী। আজ তো গরম নয়। এয়ারকুলার চালিয়েছ কেন রামু?

সাহেব বললেন।

শঙ্কর ডাইনিং টেবিলে ব্রেকফাস্টের শূন্য প্লেটের দিকে চেয়ে বসে ছিল। রামু গরম টোস্টে মাখন মাখাচ্ছে।

শঙ্কর বলল, বাসুদেব মারা গেছে।

রীণা সামান্য বিস্মিত হয়ে থমকাল, কে মারা গেছে?

সেই স্কাউলেটা।

রীণা বিহ্বলের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, কে খবর দিল?

বাংলা খবরের কাগজের শেষ পাতায় আছে। দেখে নিয়ে।

রীণার তাতে উৎসাহ দেখা দিল না। সে শঙ্করের উলটো দিকে চেয়ারে বসে দুহাতে মাথাটা চেপে একটু বসে রইল।

আর ইউ শকড?

রীণা ধীরে মুখটা তুলে বলল, আর ইউ হ্যাপি?

শঙ্কর নিজেকে সংযত করে নিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে বলল, আই শ্যাল নেভার বি হ্যাপি।

রামু সযত্নে মাখন মাখানো টোস্ট তার প্লেটে স্থাপন করল বটে, কিন্তু শঙ্কর সেটা ছুঁলই। রামুর দিকে চেয়ে বলল, থাক, আর দিস না। আজ আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। বরং হাফ কাপ কফি দে। একটু তাড়াতাড়ি।

রীণা প্রায় একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। চোখের পলকও যেন পড়ছে না। চোখের দৃষ্টি অবশ্য নিস্তেজ।

কফিতে উপর্যুপরি দুটো চুমুক দিয়ে শঙ্কর বলল, আই অ্যাম সরি ফর মাই রি অ্যাকশনস।

রীণা কিছুই বলল না। কেমন একটা বিহ্বল চাহনি নিয়ে বসে রইল। ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়েই উঠে পড়ল শঙ্কর। বলল, চলি। ব্যাপারটা ভুলতে শঙ্করের দেরি হবে না। অফিসে গিয়ে কাজে ও কথায় অন্য একটা জগতে চলে যাবে সে। বাসুদেব সেনগুপ্ত নামে একটি রাহুর কথা তার মনে থাকবে না।

শঙ্কর চলে যাওয়ার পর লিভিং রুমে গিয়ে খবরের কাগজটা দেখল রীণা। খুব সামান্য খবর হিসেবেই ছেপেছে। একটা ছবি অবধি নেই। গত ছ'বছরে বাসুদেবের চেহারার কীরকম ভাঙচুর হয়েছিল কে জানে!

শোক নয়, হাহাকার নয়। আজ রীণার বড় লজ্জা করছে। আজ তার কান্নাও এচ্ছে। বাসুদেব যে কেন এসেছিল তার জীবনে! অনেকদিন আগে তারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাসুদেব ডিভোর্স করবে শিখাকে, রীণা ডিভোর্স করবে শঙ্করকে। তারপর বাসুদেব আর রীণা বিয়ে করবে। করলে আজ কী হত?

রীণা জানালার ধারে বসে রইল চুপচাপ।

সাড়ে আটটায় অজু ফিরল। অজু মানে অজাতশত্রু। রীণার ছেলে, কিন্তু শঙ্করের ছেলে নয়। অজু বাসুদেবের ছেলে। রীণার সন্দেহ হয়, সে বা শঙ্কর অজুকে ঘটনাটা কখনও না জানালেও কোনও না কোনও ভাবে অজু সেটা জানে।

অজুর ইস্কুল-কলেজের খাতায় বাবা হিসেবে শঙ্কর বসুর নাম আছে। বাবার নাম জিজ্ঞেস করলে অজু আজও শঙ্করের নামই বলে। কিন্তু হয়তো যা বলে তা বিশ্বাস করে না। কী করে অজু জানে বা সন্দেহ করে তা রীণা বলতে পারবে না। হতে পারে, বাসুদেবই ওকে জানিয়েছে। অন্তত সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দশ বছর আগে বাসুদেবের সঙ্গে যখন রীণা সম্পর্ক ছেদ করে তখন বলে কয়েই করেছিল। বাসুদেব অপমান বোধ

করেছিল তাতে। আর সেই অপমানের প্রতিশোধ এভাবেই হয়তো নিয়েছে। এমনও হতে পারে, শঙ্করই জানিয়েছে ওকে। কারণ জন্মাবধি অজাতশত্রুকে শঙ্কর সহ্য করতে পারেনি কখনও। কোলে নেওয়া, আদর করা তো দূরে থাক, শিশুটির দিকে তাকাতেও শঙ্কর ঘেন্না পেত। তথাকথিত বাবার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার পেয়ে অজাতশত্রু অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কখনও শঙ্করের কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেনি। কিন্তু পরমার প্রতি শঙ্কর ছিল অন্যরকম। পরমা বলতে শঙ্কর অজ্ঞান। আর পরমার মুখে বাপের মুখশ্রীর অবিকল ছাপ। অজাতশত্রু সেটাও লক্ষ করেছে নিশ্চয়ই। দুই সন্তানের প্রতি এই যে দু'রকম ব্যবহার এটা থেকে অজাতশত্রু নিজেও কিছু অনুমান করে নিয়ে থাকতে পারে। সে প্রখর বুদ্ধিমান।

বলতে নেই, অজুর চেহারাটা চমৎকার, দীঘল, অ্যাথলেটের মতো শরীর। মুখখানায় রীণার মুখ যেন বসানো। কিন্তু শরীর? শরীরের গঠনে এবং শারীরিক প্রকৃতিতে সে অবিকল বাসুদেব। আঠেরো বছর বয়সেই সে বেশ নামকরা স্পোর্টসম্যান। স্কুল এবং জেলা স্তরে স্পোর্টসে গাদা গাদা প্রাইজ পেত। এখন টেনিস খেলছে মন দিয়ে। ভালই খেলে। ক্রিকেটেও চমৎকার হাত। সে ভারতের সবচেয়ে দুরন্ত ফাস্ট বোলার হওয়ার চেষ্টা করছে। হোটেল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি অজু অচিরেই নিজের অর্জনে দাঁড়িয়ে যাবে। রীণা সেই চেষ্টাই করেছে, যাতে অজু তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় এবং শঙ্করের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। শঙ্কর রীণাকে আকণ্ঠ ভালবাসত, হয়তো এখনও বাসে। কিন্তু অজুর জন্যই তাদের ভালবাসাটা শঙ্করের কাছে নিষ্কণ্টক হয়নি কখনও। অজু একটা চক্ষুশূল ছাড়া আর কিছু নয় শঙ্করের কাছে। বরাবর ছেলেকে নিজের পাখনার আড়ালে আগলে রেখেছে রীণা। অজু জারজ ঠিকই কিন্তু রীণা তো মা।

গায়ে সাদা টি-শার্ট, পরনে শর্টস, পায়ে কেডস অজু হলঘরে ঢুকে পাখার নীচে শরীর জুড়োচ্ছে। সকালে অনেকটা দৌড়োয় অজু। এবং ইচ্ছে করেই সাড়ে আটটার পর ফেরে। হিসেব করেই ফেরে, যাতে শঙ্করের সঙ্গে মুখোমুখি না হতে হয়। প্রায় বাল্যকাল থেকেই শঙ্করের সঙ্গে এই টাইমিং-এর পার্থক্য রাখতে অভ্যাস করে ফেলেছে সে। তারা একই টেবিলে বসে খায়, তবে বিভিন্ন সময়ে, তাই খাওয়ার টেবিলে দেখা হয় না। একই ঘরের

বাতাসে দু'জনে কখনও একসঙ্গে খাস নেয় না। অজু কখনও এর জন্য অভিযোগ করেনি। জন্মাবধি ব্যাপারটা হয়ে আসছে বলে তার কাছে বোধহয় অস্বাভাবিকও লাগে না।

অজু পোশাক ছেড়ে স্নান করতে গেল।

ছেলেটা খেতে ভালবাসে। শরীরের পরিশ্রমের জন্যই ওর খিদে বেশি। রীণা উঠল। গিয়ে দেখল টেবিলে খাবারদাবার ঠিকমতো সাজানো হয়েছে কি না।

রামু ছ'বছরের পুরনো লোক। সবই জানে। এও জানে এ বাড়ির কর্তার সঙ্গে অজুর সম্পর্ক ভাল নয়। তাই রামুর ব্যবহারে অজুর প্রতি সূক্ষ্ম অবহেলা থাকতে পারে, এই ভয়ে ছেলের খাওয়ার সময় রীণা কাছেপিঠে থাকে।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রীণা রাঁধুনি অম্বিকাকে বলল, ফ্রিজের খাবার মাইক্রোওয়েভে বসিয়েছ?

না বউদি।

বসাও। অজু চানে গেছে। মাছটা রান্না হয়েছে তো?

হয়েছে।

তাড়াতাড়ি করো। ও মা। আলুভাজা এখনও চড়াওনি যে!

চড়াচ্ছি।

বিরক্ত রীণা বলে, আগে বসাওনি কেন? আলুভাজা হতে সময় লাগে, জানো না?

সরু করে কাটছি, হয়ে যাবে বউদি।

রীণা ফের লিভিংরুমে এসে বসল। খবরের কাগজগুলো সরিয়ে ফেলবে কি না ভাবল একবার। অজু অবশ্য খবরের কাগজ কমই দেখে। দেখলে খেলার পাতাটা। আর এই পাতাতেই খবরটা আছে।

না লুকিয়ে লাভ নেই। বরং দেখলে দেখুক। দশ বছরের বেশিই হয়েছে বাসুদেবের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার। তখন অজুর দশ-এগারো বছর বয়স। লোকটা বোজ আসে কেন, মায়ের সঙ্গে এত কী কথা, এসব জিজ্ঞেস করত অজু। এবং বাসুদেবকে একদমই পছন্দ করত না সে। বাসুদেব এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির পুরুষ। অজু তার ছেলে জেনেও কোনওদিন ছেলেটাকে কাছে ডাকেনি বা আদরটাদর করেনি।

রীণার হঠাৎ মনে হল আজ কি অজুর মাছটাছ খাওয়া উচিত? বাপ মরলে ছেলের তো হিন্দুমতে অশৌচ হয়। অশৌচের অন্যান্য নিয়ম পালন না-ই করল, অন্তত আমিষ খাওয়াটা বন্ধ রাখা উচিত নয় কি?

রীণা উঠে ফের রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

অম্বিকা, একটা কাজ করো, আজ অজুকে মাছটাছ দিয়ো না।

অম্বিকা অবাক হয়ে বলে, দেব না?

না। তার চেয়ে বরং গরম ভাতে একটু ঘি দিয়ো। আর ফ্রিজে ছানা আছে, টক করে একটু ছানার ডালনা বেঁধে দাও।

তাতে তো সময় লাগবে বউদি।

লাগুক। আমি ওকে একটু বসিয়ে রাখবখন। ডালনার আলুটা মাইক্রোওয়েভে সেদ্ধ করে নাও। তা হলে ডালনা করতে দশ-পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে না।

রীণার ভয়, এসব নিয়ম পালন না করলে যদি ছেলেটার অমঙ্গল হয়! অভিশাপ নিয়েই জন্মেছে। দিনরাত ওর মৃত্যুই কি কামনা করে না শঙ্কর?

প্রায় পনেরো মিনিট বাদেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে ডাইনিং হলের টেবিলে মাকে দেখে অজু হাসল, হাই মা, মুখটা অমন শুকনো করে বসে আছ কেন?

নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছে না রীণা। বলল, এমনি।

মা ছাড়া অজুর আপনজন আর কেউ নেই, এটা একমাত্র রীগা জানে। তাই ছেলেটার জন্য তার বুকের মধ্যে একটা ভয় সবসময় পাখা ঝাঁপটায়। সে বেঁচে থাকতে থাকতে অজুটা যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায় তবেই রক্ষে।

শঙ্কর সংকীর্ণমনা নয়। তবু কিছুদিন আগে শঙ্কর রাতে শোওয়ার সময় তাকে বলেছিল, দেখো রীণা, আমার ইচ্ছে নয় যে, আমি মারা গেলে আমার বিষয় সম্পত্তি বা টাকাপয়সার ভাগীদার অজু হয়। মনে হয় ব্যাপারটা অজুকে আগে থেকে বলে রাখা ভাল। নইলে ওর হয়তো একটা এক্সপেকটেশন তৈরি হয়ে যাবে।

রীণা অসহায়ভাবে বলেছিল, কীভাবে বলব?

সেটা তোমার দায়িত্ব, আমার নয়। পিতৃপরিচয়টা মিথ্যে হলেও তোমার মুখ চেয়ে স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু ওয়ারিশন হিসেবে ওকে মেনে নিতে পারি না।

আমাকে একটু সময় দাও। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।

সেটাই ভাল। আমার তো মনে হয়, ইট ইজ হাই টাইম টু টেল হিম দি টুথ। লেট হিম গো টু হিজ বায়োলজিক্যাল ফাদার অ্যান্ড লিভ উইথ দ্যাট স্কাউড্রেল। আমি তো অনেক দিন ওর দায়িত্ব পালন করেছি, যা আমার পালন করার কথাই নয়।

শঙ্করকে একটুও দোষ দেয় না রীণা। শঙ্কর বরং ভদ্রলোক বলেই সব সয়ে নিয়েছে। শুধু রীণার মুখ চেয়ে। শুধু এক অদ্ভুত ভালবাসা ও মায়া কাটাতে পারেনি বলে রীণার সব অমূলক শর্ত মেনে নিয়েও সে রীণাকে ছাড়তে চায়নি। পৌরুষের সব অপমান হজম করে গেছে। আজ যদি তার ক্ষতবিক্ষত মন কিছু বিদ্রোহ ঘোষণাই করে তাতে দোষ কোথায়?

কিন্তু রীণা যে জিনিসটা আজও বুঝে উঠতে পারে না, তা হল শঙ্করের তার প্রতি ভালবাসা। এরকমও হয়? এরকম কেন হয়? শঙ্কর কি ভীষণ ভাল একজন মানুষ? শঙ্কর কি খুব মহান?

অজু পোশাক পরে খেতে এল। এ সময়ে তার চোখে মুখে পেটের সাংঘাতিক খিদেটা ফুটে ওঠে।

মা, একটা ভাল খবর আছে। কী খবর? নেক্সট উইকে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং-এর জন্য পুরী নিয়ে যাবে। এক সপ্তাহের টুর।

রীণা মৃদু স্বরে বলল, ভালই তো।

রামু খাবার নিয়ে এল। গোগ্রাসে খাচ্ছে অজু। বলল, বাঃ, আজ ঘি দিয়েছ! ফাইন!

রীণা সতর্ক গলায় বলল, আজ কিন্তু নিরামিষ।

ভ্রু কুঁচকে তাকাল অজু, নিরামিষ! নিরামিষ কেন?

এমনি।

অজু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, এন্টায়ার মিলটাই নিরামিষ। জীবনে শুধু নিরামিষ তো কখনও খাইনি।

আজ খা। খেয়ে দেখ, খারাপ লাগবে না। মাঝে মাঝে নিরামিষ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

তার মানে এখন থেকে কি মাঝে মাঝেই নিরামিষ হবে নাকি?

সেটাই ভাবছি।

তা হলে বাইরে সাঁটাতে হবে।

রীণা দৃঢ় গলায় বলল, না। বাইরেও খাবে না।

বিস্মিত অজু বলে, বাইরেও না?

রীণা নরম হয়ে বলল, মাঝে মাঝে নিরামিষ খাওয়া যখন ভাল, তখন বাইরেই বা খাবি কেন? এটুকু সংযম নেই?

অজু কঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, নিরামিষ খেলে কি পেট ভরে? মনে হয় খাওয়াই হয়নি।

একটা মোটে দিন তো!

আচ্ছা, ঠিক আছে।

একটা দিন, মাত্র একটা দিনই হয়তো নিয়মটা রক্ষা করতে পারবে রীণা। কিন্তু তারপর আর পারবে না। পারতে হলে সত্য উদঘাটন করতে হয়। তার চেয়ে বড় যন্ত্রণাদায়ক আর কী আছে? যাক, একদিনই নিরামিষ খাক। নিয়মরক্ষা হলেই হল। অমঙ্গলের ভয়টা হয়তো তার অমূলক। সাহেবদের তো এসব নিয়ম নেই, কই তাদের তো কিছু হয় না।

অজু হঠাৎ বলল, আজ তোমাকে একটু আউট অফ ফর্ম দেখাচ্ছে। কেন বলো তো! ঝগড়াটগড়া হয়নি তো।

অবাক হয়ে রীণা বলে, ঝগড়া! ঝগড়া কেন হবে?

সেটাই তো ভাবছি। তোমাদের তো কখনও ঝগড়া হয় না। ইজ সামথিং রং?

সামথিং ইজ ভেরি মাচ রং। কিন্তু সেটা রীণা কবুল করে কী করে? সে মৃদু স্বরে মিথ্যে কথা বলল, শরীরটা ভাল নেই।

কী হয়েছে?

তেমন কিছু নয়। মাঝে মাঝে তো শরীরটা খারাপ হতেই পারে। বয়স হচ্ছে না?

তোমার আর এমন কী বয়স হল মা? মিড ফটিজ হয়তো।

কম নাকি? মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি।

নতুন একটা পা খুলেছে এ পাড়ায়। যাবে? শাওনা বাথ, ম্যাসাজ সব আছে। দে উইল মেক ইউ ফাইটিং ফিট।

ও বাবা! জন্মে ওসব করিনি, এখন সহ্য হবে না।

আরে না। কত বুড়বুড়ি যাচ্ছে। তোমরা বাঙালি মেয়েরা ফিটনেস জিনিসটাই বোঝো না । গ্যাস অম্বল প্রেশার টেনশন নিয়ে জবুথবু হয়ে বসে থাকো। চলো না মা, এটাতে খুব আলট্রা মডার্ন গ্যাজেটস আছে।

শরীর দিয়ে আর হবেটা কী?

ওই তো তোমাদের দোষ। শরীর ছাড়া কিছু নেই মা। শরীর ঠিক না থাকলে আর সবই তো মিনিংলেস হয়ে যাবে।

অজু খাওয়া শেষ করে উঠল। মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ হাত মুছতে মুছতে বলল, আমার খুব ইচ্ছে করে পরমাটাকেও ভরতি করে দিতে। বারো মাস অ্যালার্জিতে ভোগে। একটু ব্যায়ামট্যায়াম করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আশ্চর্যের বিষয়, পরমাকে অজু বড্ড ভালবাসে। আর পরমাও দাদার ভীষণ ভক্ত। দু'জনের মধ্যে বয়সের অনেক তফাত বলে পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো তাদের ঝগড়াঝাঁটি হয় না। আর লক্ষ করার বিষয় হল, পরমা যে-কোনও ব্যাপারে তার দাদাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করতে চায় না। কিন্তু পরমা বাচ্চা পরমাও জানে, তার বাবা তার দাদাকে পছন্দ করে না। আর সেই জন্যই বাবার সামনে সে কখনও তার দাদার কাছে বড় একটা ঘেঁষে না।

রীণা বলল, ব্যায়াম ছাড়া তুই আর কিছু বুঝিস না, না?

লিভিংরুমের মস্ত কাঁচের শার্সি দিয়ে সকালের রোদ এসে ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছে। ঘন নীল আর সাদা স্ট্রাইপের টি-শার্ট আর ক্রিম রঙের প্যান্ট পরা অজু যখন সেই রোদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল তখন হঠাৎ যেন বাসুদেবের একটা চিত্র ফুটে উঠল তার অবয়বে। রীণার বুক

সর্বনাশের আশঙ্কায় কেঁপে গেল কি হঠাৎ? অজু কি জানে?

অজু খবরের কাগজগুলো একের পর এক তুলে টপাটপ চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। রীণার বুক কাঁপছে।

অজু যেমন অবহেলায় কাগজ তুলে নিয়েছিল তেমনি অবহেলায় রেখে দিয়ে বলল, চলি মা।

এসো গিয়ে।

অজু বেরিয়ে গেলে এক কাপ চা খেল রীণা। এখন আর তার কিছু করার নেই। পরমার মর্নিং স্কুল শেষ হবে সাড়ে দশটায়। ফিরতে ফিরতে পৌনে এগারোটা। ততক্ষণ নিজেকে নিয়ে বসে থাকা মাত্র।

কিন্তু বসে থাকা গেল না। ফোন বাজছে। এ বাড়িতে দুটো ফোন। কখন যে কোনটা বাজে ধরা যায় না।

রামু কর্ডলেস টেলিফোনটা এনে তার হাতে দিয়ে বলল, আপনার।

হ্যালো।

একটা মোটা গলা বলল, কেমন আছেন মিসেস বোস?

গলাটা চেনা ঠেকল না রীণার কাছে। সে বলল, কে বলছেন?

প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক। আমাকে আপনি চেনেন না।

ও। কী বলবেন বলুন।

আজকে খবরের কাগজে একটা খবর আছে, দেখেছেন?

রীণার বুকটা ফের ধক করে উঠল। সে স্তিমিত গলায় বলল, কোন খবর?

দেখেননি! অবশ্য খবরটা এতই ছোট যে চোখে পড়ার মতো নয়। এনি ওয়ে, খবরটা খেলার পাতায় খুঁজলেই পেয়ে যাবেন।

রীণা একটা অজানা আশঙ্কায় শীতল হয়ে যাচ্ছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি কে বলছেন?

বললাম তো আমাকে চিনবেন না। আপনি বরং খেলার পাতাটা চেক করুন। আমি ফোন ধরে আছি।

রীণা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কোন খবরের কথা বলছেন তা বুঝতে পারছি না।

কণ্ঠস্বর সামান্য একটু হেসে বলল, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল নাকি মিসেস বোস? খবরটা জনসাধারণের কাছে ছোট হলেও আপনার কাছে তো ছোট নয়। ইট ইজ এ বিগ নিউজ ফর ইউ।

রীণা জানে, তার আর বাসুদেবের সম্পর্কটা তত গোপন কিছু নয়। কেউ কেউ জানে বা অনুমান করে। কিন্তু সময়ও তো অনেক বয়ে গেছে। তবু এই অচেনা গলা শুনে তার বুক কাঁপে কেন? সারা জীবনের অপরাধবোধ কি ঘুলিয়ে উঠছে? সে আরও দুর্বল গলায় বলল, আমাকে বিরক্ত করবেন না, প্লিজ।

আপনি কি শোকাভিভূত?

প্লিজ।

আরে, শোকের কী আছে? একটা বজ্জাত লোক দুনিয়া থেকে কমে গেছে এ তো ভাল খবর।

প্লিজ।

শুনুন, শুধু খবরটা দেওয়ার জন্যই আপনাকে ফোন করছি না। কারণ আমার সন্দেহ, আমি দেওয়ার আগেই খবরটা আপনি পেয়ে গেছেন।

তা হলে কেন ফোন করছেন?

কাগজে লিখেছে বাসুদেব সেনগুপ্ত হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। কিন্তু ঘটনাটা তা নয়।

রীণা চুপ করে থাকল।

শুনছেন?

হ্যাঁ।

হার্ট অ্যাটাক বটে, তবে হার্ট অ্যাটাকটা খুব নিপুণভাবে ঘটানো হয়েছিল।

তার মানে?

একজন অতিশয় দক্ষ হত্যা-শিল্পী অত্যন্ত নিখুঁতভাবে একটা বদমাশকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না। প্লিজ। এবার ছাড়ছি।

ছাড়বেন? তা ছাড়তে পারেন। সেটা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু ফোনের লাইন কেটে দিলেই কি সব ঘটনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন মিসেস বোস? ইউ হ্যাভ এ পাস্ট।

রীণা ফোন ছাড়ল না, শক্ত করেই ধরে রইল। কিন্তু কিছু বলতেও পারল না সে, চুপ।

মিসেস বোস?

বলুন, শুনছি।

দ্যাটস গুড। কথার মাঝখানে লাইন কেটে দেওয়া আমার অপমানজনক বলে মনে হয়।

বুঝলাম। কিন্তু এসব কথা আমাকে কেন বলছেন?

বলার একটা গুরুতর কারণ আছে।

কী কারণ?

বাসুদেবের ফ্ল্যাটে তার মৃত্যুর পরদিন সকালে একজন লোক তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিল। শ্রদ্ধাদ্ধা আসলে একটা হাস্যকর লোকদেখানো ব্যাপার। আপনি ভালই জানেন শ্রদ্ধা পাওয়ার মতো লোক বাসুদেব ছিল না। যারা এসেছিল নিতান্ত দায়ে পড়ে, ভদ্রতার খাতিরেই এসেছিল। যাকগে, যার কথা বলছিলাম। লোকটা গোয়েন্দা পুলিশের একজন টিকটিকি। নাম শবর দাশগুপ্ত। বাসুদেবের মৃত্যুটা যে অস্বাভাবিক তা সন্দেহ করার কারণ

তার এখনও নেই। তবু বলে রাখি, সে বাড়ির দারোয়ান এবং আরও দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে গেছে। হতে পারে হি হ্যাজ এ হাঞ্চ।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বুঝবেন। মানুষের মস্তিষ্ক এক অত্যাশ্চর্য স্টোরহাউস। এখন যা বুঝতে পারছেন না বলে মনে হচ্ছে তা হঠাৎ পরে এক সময়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে গেলেই বুঝতে পারবেন। বাই দি বাই, আপনার ছেলেটির নাম যেন কী?

কেন?

এমনি জিজ্ঞেস করছি। ইচ্ছে না থাকলে বলবেন না।

না, বলতে বাধা কী? তার নাম অজাতশত্রু বসু।

বসু? ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসু ছাড়া আর কীই বা হতে পারে?

আপনি নোংরা এবং ইতর।

আমি? হাঃ হাঃ, হাসালেন ম্যাডাম। এনি ওয়ে, বাই..

৪. শবর দাশগুপ্তর মনটা ভাল ছিল না

আজ শবর দাশগুপ্তর মনটা ভাল ছিল না। পরাশর ঘোষালের কেসটা তাকেই দেওয়া হয়েছিল। কাজটা যন্ত্রণাদায়ক। পরাশর ঘোষাল তার সহকর্মী। এক ধাপ নীচের সহকর্মী এবং মোটামুটি বন্ধু মানুষ।

শবর জানে, পরাশরের অপরাধ গুরুতর। লালচাঁদ মার্ডার কেস এবং উলটোডাঙায় ডাকাতির দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেয়ে ঘোষাল অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায় চলে যায়। যে ট্রেলটি সে পেয়েছিল তাতে পুরো গ্যাং ধরা পড়ে যেত। কিন্তু মানুষের কিছু কিছু দুর্বলতা থাকেই। ঘোষাল ঘুষ খায় না, অতি সৎ মানুষ। তবে তার দুর্বলতা ছিল অন্য জায়গায়। তার একটি মাত্র সন্তান, তার ছেলে তন্বিষ্ঠ। ছেলের প্রতি দুর্বলতা কোন বাপের না থাকে? কিন্তু ঘোষালকে জব্দ করা হল ওই রন্ধ্রপথেই। গ্যাং থেকেই একজন একদিন ঘোষালকে ফোন করে বলল, স্যার, আমরা জানি, আপনি খুব ভাল একজন পুলিশ অফিসার। হয়তো আমাদের ধরেও ফেলবেন। কিন্তু আপনার ভালর জন্যই বলছি, কেসটা যদি আর এগোয় তা হলে উই উইল কিল-না স্যার, আপনাকে নয়, উই উইল কিল ইয়োর সান তন্বিষ্ঠা।

এই হুমকি রোজ আসত। ঘোষাল ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ল, নিস্তেজ হয়ে গেল। এমনকী গ্যাং- এর নির্দেশে সে কেসটা থেকে জরুরি কাগজপত্র সরিয়ে ফেলল। তদন্ত শুধু থেমেই গেল না, ঘুরেও গেল।

আজ সারা সকাল ঘোষালকে জেরা করতে হল শবরের।

ঘোষাল ঘামছিল, বারবার জল খাচ্ছিল। শেষে ধরা গলায় বলল, বলুন মিস্টার দাশগুপ্ত, আমার জায়গায় আপনি হলে কী করতেন?

শবর গম্ভীর গলায় বলল, আমি বিয়ে করিনি, কাজেই ছেলেপুলেও নেই। আমি আপনার প্রবলেম আপনার মতো করে বুঝতে পারব না। তবে ব্যাপারটা আপনি পুলিশকে জানালে পারতেন।

ঘোষাল রুমালে কপালের ঘাম মুছে বলল, হ্যাঁ পারতাম। জানাইনি, কারণ পুলিশ আমার ছেলেকে চব্বিশ ঘণ্টার প্রোটেকশন দিতে পারত না। হি ওয়াজ ইন মরটাল ডেনজার।

ঘোষালবাবু, পুলিশের চাকরিতে ওরকম কতই তো ফাঁকা হুমকি শুনতে হয়। ভয় পেলে চলে!

ফাঁকা! কে জানে ফঁকা কি না। তবে ছেলের জন্য আমি ভারী ভয় পেয়েছিলাম। আমি আপনার মতো সাহসী নই মিস্টার দাশগুপ্ত।

ঘোষালের সাসপেনশন অবধারিত। রিপোর্টের অপেক্ষা শুধু। শবরের তাই মন খারাপ। এক-একটা দিন এমন আসে যে, মনে হয় এ চাকরিটা না করতে হলেই ভাল ছিল।

এনকোয়ারির একদম শেষে ঘোষাল জিজ্ঞেস করেছিল, আমার কী হবে মিস্টার দাশগুপ্ত? চাকরি যাবে? আমার যে ঘুষের টাকা নেই। আমার যে অতি কষ্টেই সংসার চলে। চাকরি গেলে–

আপনি টাকাপয়সায় সৎ আমি জানি। কিন্তু দুর্বলতাও তো এক ধরনের ডেফিসিয়েন্সি। চারিত্রিক ডেফিসিয়েন্সি। ঘোষালবাবু, আমি ভাগ্যবিধাতা নই। আই উইশ ইউ গুড লাক।

স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা–এসব জিনিস কি মানুষকে জরাব করে দেয় নাকি? অন্ধ স্নেহে সাধারণ বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেক বিসর্জন দিতে হলে তো দুনিয়া পিছন দিকে হাঁটতে থাকবে! ঘোষাল বুদ্ধিমান এবং দক্ষ একজন পুলিশ অফিসার। ডিপার্টমেন্টে তার সুনামও বড় কম নয়। পুত্রস্নেহে সে একটা কেস গুবলেট করে দিল এবং মেনে নিতে হল চাকরির ক্ষতিও। শবরের জানতে ইচ্ছে করে, যে ছেলের জন্য ঘোষালের এত দুর্বলতা, সেই ছেলে

ভবিষ্যতে ঘোষালকে কী দেবে? আজকালকার ছেলেরা কি পিতৃঋণ কথাটা নিয়ে কখনও ভাবে? বাবা তাদের আইডল নয়, প্রতীক নয়, এমনকী তেমন মান্যগণ্যও কেউ নয়। বাবা শব্দটাই কত হালকা হয়ে গেছে এখন!

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বাংলায় অনেকদিন আগে একটা রচনা এসেছিল, কোনও মহাপুরুষের জীবনী। একটা ছেলে লিখেছিল, আমি একজন মহাপুরুষকে রোজ দেখতে পাই চোখের সামনে। তিনি সামান্য বেতনের একজন কর্মচারী। সংসার চালাতে তাকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। তার একখানা মাত্র জামা, একখানা মাত্র কাপড়। সন্ধেবেলা এসে সেগুলো কাঁচেন, সকালবেলা ফের পরে বেরোন। তিনি কখনও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন না, মিথ্যে কথা বলেন না, ভাগ্যকে দোষ দেন না। উপদেশ দিতেও তিনি ভালবাসেন না। এই মহাপুরুষটি হলেন আমার বাবা। এঁর জীবনী কখনও কোনও ইস্কুলে পড়ানো হবে না, এর কথা কেউ জানতেও পারবে না কখনও, কিন্তু আমার কাছে এমন মহাপুরুষ আর কে?...

দীর্ঘ রচনাটি পড়ে শবরের ইস্কুলমাস্টার জ্যাঠামশাই বাড়িসুদ্ধ লোককে তা পড়ে শুনিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, এমন সোনার টুকরো ছেলেকে কি এক নম্বরও কম দিতে পারি? কুড়িতে কুড়িই পেয়েছিল সেই ছেলেটা।

শবর ভাবছিল, এখনকার কোনও ছেলে কি আর তার বাবার ভিতরে মহাপুরুষ খুঁজে পায়?

দুপুরে ঘোষালের রিপোর্টটাই লিখছিল শবর, এমন সময়ে মধুমিতার ফোন এল।

টুকুদা, একটা প্রবলেম হয়েছে।

কী প্রবলেম?

পাড়ার একটা ক্লাবের কিছু ছেলে আমার শাশুড়ির কাছে টাকা চাইছে। পাড়ায় নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাটে কেউ এলে নাকি ওদের টাকা দিতে হয়।

ক্লাবটার নাম কী?

সবুজ সংঘ।

কত টাকা চাইছে?

সে অনেক টাকা। কুড়ি হাজার।

লোকাল থানায় জানিয়েছিস?

জানানো হয়েছে। তারা এসেছিল। কিন্তু সবুজ সংঘের সেক্রেটারি বলেছে, ক্লাব থেকে টাকা চাওয়া হয়নি। পাড়ার কিছু মস্তান ছেলে এসব করে।

এই প্রথম চাইল, না আগেও চেয়েছে?

শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতেও নাকি একবার এসেছিল। উনি কেমন মানুষ ছিলেন তা তো জানোই। রাগারাগি, চেঁচামেচি করে আর হুমকি দিয়ে ছেলেগুলোকে তাড়ান। কিন্তু শাশুড়ি তো তা পারবেন না। উনি ভয় পাচ্ছেন। তুমি কিছু করতে পারো না?

পারি। কিন্তু তাতে তোর শাশুড়ির প্রবলেম হয়তো বাড়বে।

ছেলেগুলো প্রতিশোধ নেবে বলছ?

সেটাই সম্ভব।

তা হলে?

অর্ক আর বুদ্ধকে বল ছেলেগুলোর সঙ্গে একটা মিটমাটে আসতে। ওদের বলুক যে, ফ্ল্যাটওনাররা সবাই এলে মিটিং করে একটা থোক টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। ইনডিভিজুয়ালি দেওয়া হবে না।

ওরা যে ভয় দেখাচ্ছে। তুমি নেগোশিয়েট করতে পারো না?

শবর একটু ভেবে বলল, পারি, ছেলেগুলোর কারও নাম বলতে পারবি?

একজনের নাম প্রকাশ, আর একজন কালু। প্রকাশ নাকি বড় মস্তান, খুনখারাপিও করেছে।

ঠিক আছে।

আরও একটা কথা।

বল।

শ্বশুরমশাইয়ের একটা এলআইসি পলিসি পাওয়া গেছে, যার নমিনি অজাতশত্রু বসু।

সে আবার কে?

মধুমিতা একটু হেসে বলল, শ্বশুরমশাইয়ের অবৈধ সন্তান।

ওঃ, মাই গড! কত টাকার পলিসি?

পাঁচ লাখ।

হুঁ, তা এ ব্যাপারে তো আর আমার কিছু করার নেই রে।

না, তা নেই। কিন্তু পলিসিটা বেরোবার পর বাড়িতে প্রচণ্ড অশান্তি হচ্ছে।

কার সঙ্গে কার?

সকলের সঙ্গে সকলের, অর্ক আর বুদ্ধ তো ঠিক করে ফেলেছে তারা বাপের শ্রাদ্ধশান্তি করবে না। শাশুড়ি কান্নাকাটি করছেন।

কিন্তু পলিসিটার কী হবে?

সেটাই তোমার কাছে জানতে চাইছি। নমিনি বদল করা যায় না?

আমি কি সবজান্তা? উকিলের সঙ্গে কথা বলতে বল।

আর একটা কথা তোমাকে জানাতে বলেছে অর্ক।

কী কথা?

লিফট কোম্পানির লোক এসেছিল। অর্কই তাদের টেলিফোন করে জানিয়েছিল, লিফট খারাপ ছিল বলেই শ্বশুরমশাই সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে মারা যান। লিফট কোম্পানির লোকেরা বলে গেছে, সেদিন তাদের সার্ভিসিং-এর কোনও লোক এ বাড়িতে আসেনি।

শবর সংক্ষেপে বলল, ও।

আচ্ছা টুকুদা, তুমি নাকি শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় বলে সন্দেহ করছ?

কে বললে?

অর্কই বলছিল। তুমি নাকি দারোয়ানকে জেরা করে গেছ সেদিন।

ও কিছু নয়।

ফাউল প্লে বলে সন্দেহ হয়?

হতেই পারে। তবে জল ঘোলা করে লাভ নেই। প্রমাণ করা শক্ত।

তুমি তো শক্ত কাজই ভালবাসো।

তোর কি ধারণা আমি সবকিছুর মধ্যেই রহস্য খুঁজে বেড়াই? দারোয়ানকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, কারণ ঘটনাটার টাইমিং কিছু অদ্ভুত এবং একটু যেন সাজানো। দারোয়ানটা অবশ্য কিছু বলতে পারেনি।

তোমার কী ধারণা?

কোনও ধারণা নেই।

সত্যি করে বলো না টুকুদা, শ্বশুরমশাইকে কি কেউ খুনটুন করতে চেয়েছিল নাকি?

বললাম তো, জানি না।

আচ্ছা, আমরা যদি চাই তা হলে তদন্ত করবে তুমি?

দূর বোকা! এত সহজ নাকি? খুন কি না তার ঠিক নেই, তদন্তের কথা উঠছে কেন?

অর্কও যে সন্দেহ করছে।

তা হলে অর্ককে বল লোকাল থানায় ডায়েরি করতে।

তারপর কী হবে?

আগে লোকাল থানা রিপোর্ট দিক, তারা যদি না পারে তখন গোয়েন্দা পুলিশ কেস হাতে নিতেও পারে। তখন দেখা যাবে।

আচ্ছা, আমি অর্ককে বলছি একটা ডায়েরি করতে। আবার জিজ্ঞেস করছি, ডায়েরি করাই কি ঠিক হবে?

হুঁ।

ভাল করে বলো।

হ্যাঁ, করুক।

তারপর তুমি কেস হাতে নেবে তো?

গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। ডায়েরি হোক তো।

ফোন ছেড়ে শবর তার রিপোর্ট লিখতে লাগল। ঠিক এই সময়ে ঘোষাল ফের ঘরে ঢুকল।

মিস্টার দাশগুপ্ত?

হ্যাঁ, বলুন।

আই অ্যাম ফিনিশড।

শবর মৃদুস্বরে বলল, আপনি যা করেছেন তাতে ভবিষ্যতে আপনার ছেলেও আপনাকে শ্রদ্ধা করবে না। কাওয়ার্ডরা শ্রদ্ধা পায় না ঘোষালবাবু।

ঘোষাল গুম হয়ে বসে রইল।

শবর সমবেদনার গলায় বলল, আপনাকে হয়তো একটা শশা কজ করা হবে। যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি জবাব দিতে পারেন তা হলে সাসপেনশনটা এড়ানো অসম্ভব হবে না।

ঘোষাল তার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলল, ছেলেটাকে আমি বড় ভালবাসি। একটু বেশিই বাসি। বেশি বয়সের সন্তান, আমাদের আর ছেলেপুলে হবেও না।

তাতে কী? একজনকেই মানুষ করুন।

ঘোষাল মাথা নেড়ে বলল, আপনি বুঝবেন না, ছেলেকে ভালবাসি বলেই ওকে নিয়ে আমার সবসময়ে দুশ্চিন্তা আর ভয়। একটু জ্বরটর হলে একটু কেটেকুটে গেলেও আমি অস্থির হয়ে পড়ি। এত উদ্বেগ আর অশান্তি নিয়ে ওকে বড় করব কী করে বলুন তো? এই যে কেসটা খারাপ হয়ে গেল, এর জন্যও তো সেই ভয়টাই দায়ী। বুঝতে পারছেন?

পারছি ঘোষালবাবু।

আমি প্রভিডেন্ট ফান্ড ডিপার্টমেন্ট থেকেই ঘুরে এলাম। যা পাওয়া যাবে তা যথেষ্ট নয়। একটা এলআইসি আছে এক লাখ টাকার। সেটাও বেশি কিছু নয় এই বাজারে। তবু হয়তো চলে যাবে। কী বলেন?

কী সব বলছেন আপনি?

ঘোষাল মাথা নেড়ে বলে, চাকরি তো দূরের কথা বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে দুঃসহ।

কেন এরকম ভাবছেন?

কী জানি! বলে ঘোষাল অসহায়ভাবে হাত ওলটাল। তারপর উঠে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শবর চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভয় দেখানোটা একটা অপরাধ। কারণ ভয় দেখাতে দেখাতে একটা লোককে স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ঠেলে দেওয়া যায়। ভয় থেকে মানুষ অনেক অন্যায় করে ফেলতে পারে। খুন অবধি। ভয় এক ভয়ংকর জিনিস। আর ভয় একবার পেয়ে বসলে সহজে তাকে ছাড়ানোও যায় না।

রিপোর্টটা আজ শেষ করতে পারল না শবর।

সে উঠে গিয়ে ঘোষালের ঘরে তার খোঁজ করল।

নন্দী বলল, উনি তো স্যার, একটু আগে চলে গেলেন।

ঘোষালের বাড়িতে টেলিফোন আছে, শবর জানে। সে বলল, ওর টেলিফোন নম্বরটা দিতে পারেন?

নিশ্চয়ই। বলে নন্দী একটা কাগজের টুকরোয় নম্বরটা লিখে শবরের হাতে দিয়ে বলল, এই যে স্যার।

শবর ঘরে ফিরে আধঘণ্টা অপেক্ষা করে নম্বরটা ডায়াল করল।

একজন মহিলা ফোন ধরলেন, সতর্ক গলায় বললেন, কে বলছেন?

লালবাজার থেকে বলছি, ঘোষালবাবু ফেরেননি?

না তো! উনি তো ওখানেই গেছেন।

আপনি কি ওঁর স্ত্রী?

হ্যাঁ।

আমি শবর দাশগুপ্ত।

ও আচ্ছা। আপনার কথা ওঁর কাছে শুনেছি। কী ব্যাপার বলুন তো! ওঁর কি চাকরিটা যাবে? উনি খুব ভাবছিলেন।

চাকরি যাবে না। কিন্তু আপনি ওঁকে একটু চোখে চোখে রাখবেন।

কেন বলুন তো!

উনি স্ট্রেস-এর মধ্যে আছেন।

তার মানে? মানসিক চাপ।

হ্যাঁ, তা তো আছেনই। রাতে ঘুমোত পারেন না। সর্বক্ষণ ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন।

আপনার ছেলে কত বড়?

এই তো, আট বছর। ছেলেও বাপের ভীষণ ভক্ত। কিছু বদমাশ তোক ছেলেকে কিডন্যাপ করবে, মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাত বলে উনি এমন পাগলের মতো হয়ে গেলেন।

আপনিও কি ভয় পেয়েছেন?

পাব না? খুবই ভয় পেয়েছি। তবে আমি ওঁর মতো অতটা ভেঙে পড়িনি।

ভয় পাওয়ারই কথা। যাই হোক, ঘোষালবাবুকে একটু নজরে রাখবেন। আমি পরে খোঁজ নেব।

না, শবরের মন ভাল নেই, ফোনটা রাখার পর আবার তার একটা অস্বস্তি হচ্ছিল।

নিতান্ত ডাইভারশনের জন্যই সে জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে এসে বড় রাস্তায় জিপ রেখে পায়ে হেঁটে পাড়ায় ঢুকল। ভয়-এই শব্দটাই বড় ভয়ংকর। এ যুগে দুটো স্পষ্ট দল দেখা যাচ্ছে। এক দল ভয় দেখায়, অন্য দল ভয় পায়।

‘আকাশ প্রদীপ’ বাড়িটার সামনে সে দাঁড়াল। গ্রিলের গেটের ভিতরে একটা লোক টুলের ওপর বসে হাই তুলছে। দারোয়ান হীরেন। সে ভিতরে ঢুকে হীরেনের সামনে দাঁড়াতেই সে উঠে পড়ে একটা সেলাম গোছের কিছু করে বলল, বলুন স্যার।

তুমি কি এ পাড়ার ছেলে?

আমার বাড়ি লাইনের ওধারে।

প্রকাশ বা কালুকে চেনো?

হীরেনের চোখে একটা ভয় ঘনিয়ে উঠল, চিনি স্যার।

কোথায় পাওয়া যাবে ওদের?

হীরেনের বাঁকবজিতে একটা সস্তা ইলেকট্রনিক ঘড়ি। টাইমটা দেখে নিয়ে সে বলল, এখন স্যার, বিকেল পাঁচটা বাজে। এ সময়ে ওরা থাকে না বড় একটা। তবে একটু এগিয়ে গিয়ে মোড়টা পেরোলে ডানদিকে পন্টুর চায়ের দোকান দেখবেন। এখানেই ওদের আড্ডা।

প্রকাশ থাকে কোথায়? আরও এগিয়ে বাঁয়ে লন্ড্রি দেখবেন, তার পিছনের বস্তিতে। লন্ড্রি ঘেঁষেই ঢোকার গলি।

ঠিক আছে।

আমি চিনিয়ে দিয়ে আসব স্যার?

না, আমি একাই ভাল।

পন্টুর দোকানে কেউ ছিল না। একজন বুড়োমতো লোক গামছা পরে বসে হাওয়া দিয়ে আঁচ তুলছিল। সময় নষ্ট না করে শবর এগিয়ে গেল। লন্ড্রির পাশের গলি দিয়ে ভিতরে ঢুকে একটা বেশ পরিচ্ছন্ন বস্তির উঠোনে পৌঁছল সে।

উঠোনটা পাকা না হলেও ইটে বাঁধানো। বিকেল পাঁচটা বাজলেও এখনও উঠোনে উনুন ধরানো হয়নি। তার মানে হয়তো বেশিরভাগ ঘরেই গ্যাস উনুন আছে। ইলেকট্রিকের কানেকশন যে আছে তা দেখতেই পাচ্ছিল শবর।

তিন-চারটে বাচ্চা খাপরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলছিল। এদের নানারকম খেলা আছে। নিত্য নতুন খেলা বানিয়েও নেয়। ওদের মধ্যে বড়জন ফ্রক পরা একটা মেয়ে। শবর তাকেই জিজ্ঞেস করল, প্রকাশের ঘর কোনটা বলো তো?

ওই যে। মেয়েটা আঙুল তুলে দেখাল।

ডানদিকের শেষ প্রান্তের ঘরটার সামনে গিয়ে শবর অনুচ্চ স্বরে ডাকল, প্রকাশ!

অপরাধীদের প্রতিক্রিয়া হয় দ্রুত। শবর ডাকতেই ঘরের জানালা টুক করে খুলে গেল।

কে?

শবর ঠান্ডা গলায় বলল, একটু কথা আছে। বাইরে এসো।

জানালা দিয়ে তাকে বোধহয় আরও একটু জরিপ করে নিল প্রকাশ। তারপর লুঙ্গি-পরা খালি গা যে-ছেলেটা বেরিয়ে এল তার মুখশ্রীতে খুব স্পষ্টই মস্তানির ছাপ। রং কালো, শরীরটা বেশ পেটানো, নাতিদীর্ঘ, পুরু ঠোঁট, ছোট চোখ, কোকড়া চুল। একটু আস্পর্ধার ভাব আছে মুখে চোখে। গলাতেও সেটা প্রকাশ পেল, কে আপনি মশাই?

শবর তার দিকে একটু চেয়ে থাকল নিষ্পলক। শবর বিশেষ লম্বানয়। বরং একটু ছোটখাটোর দিকেই। শরীর ছিপছিপে৷ তবু তাকে দেখে যারা যা বুঝবার তারা ঠিকই বুঝে যায়।

প্রকাশও বুঝল। চোখটা সরিয়ে নিয়ে বলল, আমিই প্রকাশ।

আমি লালবাজার থেকে আসছি, কিন্তু ভয় পেয়ো না। তোমার সঙ্গে কথা আছে। বাইরে চলো। বরং একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে এসো।

প্রকাশ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কিন্তু আমি কী করেছি স্যার?

বললাম তো, ভয় পেয়ো না। তোমার কাছে কয়েকটা কথা জানার আছে। ধরপাকড় করতে আসিনি।

প্রকাশ ঘরে গিয়ে গেঞ্জি নয়, পুরো প্যান্ট আর টি শার্ট পরে বেরিয়ে এল।

চলুন স্যার।

শবর তাকে নিয়ে পর দোকানেই এল।

এটা তোমার ঠেক?

হ্যাঁ স্যার।

চলো বসি।

দোকানে এখনও তেমন খদ্দের নেই। গরিব দোকান। বিস্কুট আর চা ছাড়া বোধহয় আর কিছু হয় না। জনা দুই রিকশা বা ঠেলাওলা গোছের লোক চা খাচ্ছে। বুড়ো মানুষটা চা বানাতে বানাতে একবার চোখ তুলে প্রকাশকে দেখল।

চা-টা স্যার আমিই খাওয়াচ্ছি।

খাওয়াও।

চায়ের কথা বলে দিয়ে প্রকাশ এসে পাশে বসল, এবার বলুন স্যার।

গত তেরো তারিখে আকাশ প্রদীপ বাড়ির আটতলার বাসুদেব সেনগুপ্ত মারা গিয়েছিলেন, জানো তো।

হ্যাঁ স্যার। বহুত টেটিয়া লোক।

শবর হাসল, কীরকম টেটিয়া?

আমরা স্যার, পাড়ার বেকার ছেলে। এ পাড়ায় নতুন কেউ ফ্ল্যাটট্যাট করে এলে আমরা কিছু পাই। কিন্তু বাসুবাবু আমাদের কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উনি নাকি প্লেয়ার ছিলেন, ভিআইপি-দের অনেককে চেনেন, এসব বলে ভয়ও দেখিয়েছিলেন।

আচ্ছা, সেকথা থাক। আমি বলছি তেরো তারিখ সন্ধেবেলার কথা। সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে উনি মারা যান হার্ট অ্যাটাকে।

সব জানি স্যার। লিফট খারাপ ছিল বলে উনি হেঁটে উঠতে গিয়ে বুকে খিচ হয়ে গেল। আমাদের গজু তো পুরো ব্যাপারটা দেখেছে।

গজু কে?

ওর নাম গিরিধারী। আমাদের বন্ধু। সন্ধেবেলা আকাশ প্রদীপের গ্যারেজের পিছনে বাথরুমে পেচ্ছাপ করতে গিয়েছিল। তখন দুটো লোক লিফট সারাতে আসে। তার পরেই বাসুদেববাবু এলেন। সব দেখেছে।

গজুকে কি পাওয়া যাবে?

যাবে। আপনি বসুন, আমি ডেকে আনছি। কাছেই বাড়ি।

প্রকাশ গেল এবং পাঁচ-ছ' মিনিটের মধ্যেই একটা পাতলা ছিপছিপে ছেলেকে নিয়ে ফিরে এল।

প্রকাশ বলল, স্যারকে সব বল। লালবাজারের লোক। গজুর মুখটা সবসময়েই একটু হাসিহাসি। বেঞ্চে মুখোমুখি বসে লাজুক গলায় বলল, আকাশ প্রদীপের দারোয়ান হীরেন আমার বন্ধু স্যার। মাঝে মাঝে একতলায় গ্যারেজে দুপুরবেলা আমরা তাসটাসও খেলি। বাথরুম পেলে বাথরুমেও যাই।

বুঝেছি। আকাশ প্রদীপে তোমাদের একটা ঠেক আছে।

এখনও আছে, তবে সব ফ্ল্যাটে লোক এসে গেলে আর থাকবে না।

তুমি সেদিন সন্ধেবেলা ও বাড়িতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ স্যার। হীরেন চা খেতে গিয়েছিল। আমাকে বলে গিয়েছিল গেটটা একটু দেখতে। আমি টুলে বসেছিলাম। হঠাৎ দুটো নোক এসে বলল, তারা লিফট সারাতে এসেছে।

লোকদুটোর চেহারা কীরকম বলতে পারবে?

হ্যাঁ স্যার। প্যান্ট শার্ট পরা। মাঝারি লম্বা। অর্ডিনারি চেহারা। তা

দের হাতে কোনও যন্ত্রপাতি বা বাক্স গোছের কিছু ছিল?

না স্যার।

ফের দেখলে চিনতে পারবে?

গজু একটু হেসে বলল, বলা মুশকিল স্যার। হয়তো পারব।

তারা কী করল?

লিফটে ঢুকে কীসব করছিল। এরকম সময়ে আমি বাসুদেববাবুকে ফিরতে দেখলাম। উনি আমাদের একদম পছন্দ করেন না। তাই আমি উঠে বাথরুমে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে দেখলাম উনি হীরেনকে খুঁজছেন। না পেয়ে কী ভাবলেন, তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন।

তারপর কী হল? মিস্ত্রিরা কিছুক্ষণ খুটখাট করে বেরিয়ে এল। একজন সিঁড়িটা দেখে নিয়ে অন্যজনকে বলল, চল। হয়ে গেছে। তারপর দুজনেই বেরিয়ে চলে গেল। তারা লিফটের দরজা বন্ধ করল না।

লিফটের দরজা খোলা রাখলে কী হয় তুমি জানো?

জানি স্যার। ও বাড়ির লিফটে মাঝে মাঝে আমরা ওঠা-নামা করি। দরজা ভালমতো বন্ধ না করলে লিফট চলে না।

দরজাটা কে বন্ধ করল, তুমি?

না স্যার। আমি ভাবলাম, মিস্ত্রিরা বোধহয় কিছু আনতেটানতে গেছে, আবার এসে সারাবে। তাই আমি লিফটের ধারে যাইনি। তবে আরও একটু বাদে চারতলার মৌলিকবাবুরা নেমে এলেন। মৌলিকবাবুই লিফটের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আর কিছু দেখেছ?

না স্যার।

শবর চা খেল। দোকানের চেহারা হতদরিদ্র হলেও চা-টা কিন্তু খারাপ নয়। গুঁড়ো চায়ের একটা বেশ ঝাঝালো গন্ধ আছে, দুধ চিনির মাপ চমৎকার।

শবর প্রকাশের দিকে চেয়ে বলল, বাসুদেববাবুর স্ত্রীর কাছে কত টাকা চেয়েছ?

প্রকাশ একটু ভয় খেয়ে বলল, আমরা একটু বেশিই চাই স্যার, কিন্তু পার্টি কি আর অত দেয়? দরাদরি করে অনেক নামিয়ে ফেলে।

বাসুদেববাবু আমার আত্মীয় হন।

প্রকাশ এক গাল হেসে বলল, তাই বলুন স্যার। উনি বলতেন বটে অনেক ভিআইপিকে চেনেন।

আমি ভিআইপি নই, সাধারণ গোয়েন্দা মাত্র।

আমাদের কাছে আপনিই ভিআইপি। ঠিক আছে স্যার, মাসিমাকে বলে দেবেন, কিছু দিতে হবে না।

আরে না। ছাড়বে কেন? কিছু নিয়ো।

কত নেব স্যার, দু-চারশো টাকা?

অত কম নয়। হাজার টাকা চেয়ে।

ঠিক আছে স্যার।

শবরের মন ভাল নেই। একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বাসুদেবের মৃত্যুটা যে ঘটানো হয়েছে এতে তার আর সন্দেহ নেই। ইচ্ছে করলে সে ব্যাপারটা নাড়াঘাটা নাও করতে পারে। দুনিয়ার সব ঘটনার সমাধান কি হয়?

সে উঠল। বলল, আজ চলি। মনে হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

গজু হঠাৎ বলল, স্যার বাসুদেববাবুর কেসটায় কি কিছু গড়বড় আছে?

শবর একটা শ্বাস ফেলে বলল, আছে গজু। হয়তো তোমাকে সাক্ষীও দিতে হতে পারে।

সাক্ষী দিলে কি স্যার মালকড়ি কিছু পাওয়া যাবে?

এমনিতে পাওয়া যায় না। তবে তোমার ব্যাপারটা আমি দেখব।

গজু একটু থ্রিল অনুভব করছে। বেশ খুশিয়াল গলায় বলল, কখনও সাক্ষী ফাক্ষি দিইনি স্যার। টিভিতে দেখাবে?

না। তবে কাগজে নাম উঠতে পারে।

উরেব্বাস৷ হেভি কেলো।

শবর বড় রাস্তায় এসে জিপে উঠল।

রাত দশটার পর সে ঘোষালের বাড়িতে ফোন করল।

ঘোষালগিন্নি একটু উত্তেজিত গলায় বললেন, উনি এইমাত্র ফিরলেন। কিন্তু ঘোর মাতাল অবস্থায়। কী হচ্ছে বলুন তো। উনি তো জীবনে কখনও এসব খাননি।

খুব মাতলামি করছেন?

মাতলামি করবে কী, উঠতেই পারছে না। ট্যাক্সিওলা ধরে ধরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপর একরাশ বমি করে এখন অচৈতন্য।

তা হলে ঘুমোতে দিন। সকালে ঘুম ভাঙলে ভাল করে পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দেবেন। ঠিক হয়ে যাবে।

আমার ভীষণ ভয় করছে। খুব হ্যাপি ফ্যামিলি ছিলাম আমরা, সব যে ভেঙে পড়ছে!

মানুষের খারাপ সময় তো আসে বউদি। কেটেও যায়।

ওঁর কোনও বিপদ হবে না তো? আপনি অভয় দিচ্ছেন?

দিচ্ছি।

চাকরি গেলে বা সাসপেন্ড হলে উনি বোধহয় মনের দুঃখেই মারা যাবেন।

আপনি অত ভাববেন না। সকালে আমি টেলিফোনে ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলব।

বলবেন প্লিজ! উনি ভাল লোক, কিন্তু একটু একগুয়ে।

শবর টেলিফোন রেখে অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে ঘোষালকে নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল। ভয়? ভয়ের ওপরে ওঠা মানুষের পক্ষে খুব শক্ত ব্যাপার। ভয় এক সাংঘাতিক জিনিস।

শবর ঘুমোল।

সকালে টেলিফোন করতেই ঘোষালগিন্নি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, মিস্টার দাশগুপ্ত, উনি বিষ খেয়েছেন।

বিষ!

হ্যাঁ, সকালে উঠে বাথরুমে গিয়েছিলেন। আমি চা করছিলাম। চা নিয়ে এসে দেখি উনি একটা পোকা-মারা বিষের টিন থেকে ঢকঢক করে খাচ্ছেন।

হাসপাতালে শিট করা হয়েছে?

অ্যাম্বুলেন্স আসছে। কী হবে মিস্টার দাশগুপ্ত?

আমি যাচ্ছি। শক্ত থাকুন। কতটা খেয়েছেন?

তা জানি না। আমি হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম।

শবর ফোন রেখে দ্রুত পোশাক পরে নিল। ঘোষালের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ কি সে? শবর ভাবছিল, এও কি এক ধরনের প্যাসিভ মার্ডার? মানুষ যে আসলে কত অসহায় তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

৫. কথাটা বলে দিতে চাই

আমি ওকে কথাটা বলে দিতে চাই।

কেন চাও? এতদিন পর কেন চাইছ?

ইট মাস্ট এন্ড সামহোয়ার। অভিনয় করে যাওয়ার আর কোনও মানে হয় না। সত্যটা প্রকাশিত হোক।

তুমি তো কোনওদিন ওর বাবার ভূমিকায় অভিনয় করোনি। তুমি তো ওকে সারাজীবন বুঝিয়েই দিয়েছ যে, তুমি ওর কেউ নও। আবার নতুন করে কেন তা বোঝাতে যাবে?

ওর আসল বাবা কে তা কি ওর জানা উচিত নয়?

কী দরকার? আমি যা করেছি তার শাস্তি আমি পাব। ওকে কেন? ওর তো কোনও দোষ নেই।

সমাজে ও আমার পরিচয়ে পরিচিত হবে কেন?

শোনো, ও কি আর এখন ওর স্কুলকলেজের সার্টিফিকেটে বাবার নাম বদলাতে পারবে? পারবে না। উপরন্তু ওকে যদি সব বলে দাও তা হলে ও পাগলের মতো হয়ে যাবে। ওর এত ক্ষতি তুমি করবে কেন?

আমি ওকে আমার ইনহেরিটর করতে চাই না রীণা। তোমাকে আগেও বলেছি। দীর্ঘদিন আমার টাকায় ও প্রতিপালিত হয়েছে। এডুকেশন, বোর্ড অ্যান্ড লজিং, একটা পাপের পিছনে আমার গুনোগার কিছু কম দিতে হয়নি। কিন্তু আর নয়।

যদি অজুকে এসব বলার এতই জরুরি দরকার ছিল তোমার তা হলে সেটা বাসুদেব বেঁচে থাকতে বলোনি কেন?

তাতে কী হত?

তাতে ও অন্তত বাসুদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত, তাকে প্রশ্ন করতে পারত, বাসুদেবকে বাধ্য করতে পারত ওর ভার নেওয়ার। কেন তা করোনি?

শঙ্কর টক করে প্রশ্নটার জবাব দিতে পারল না।

রীণার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছিল। কান্না জড়ানো গলায় সে বলল, তুমি কি বাসুদেবকে ভয় পেতে?

শঙ্কর দুর্বল গলায় বলল, ভয়! ভয় কেন পাব?

তা হলে বলোনি কেন? তুমি তো বাসুদেবকেও গিয়ে বলতে পারতে, তোমার ছেলের ভার তুমি নাও, আমাকে রেহাই দাও!

বাসুদেবের মুখ দেখতে আমার ঘেন্না হত।

বাসুদেব আর আমি সমান অপরাধী। তুমি আমাকে ঘেন্না করো না?

না।

কেন করো না শঙ্কর?

সেটা তুমিই বলল।

তুমি আমাকে ভালবাসো। এতটাই বাসো যে, আমার সব অপরাধ তুমি মেনে নিয়েছ। এরকম ভালবাসা বোধহয় পৃথিবীতে আর কখনও ঘটেনি। আমি সেজন্য তোমাকে মনে

মনে পুজো করি। তোমার জন্যই বেঁচে আছি শঙ্কর। আমাকে আর একবার দয়া করো, অজুকে কিছু বোলো না।

কিন্তু ইনহেরিটেন্স?

শোনো শঙ্কর, ওকে কিছু দিয়ো না তুমি। বাসুদেব ওর জন্য একটা ব্যবস্থা করে গেছে।

শঙ্কর অবাক হয়ে বলে, কী ব্যবস্থা?

বাসুদেব দু'-তিন বছর আগে একবার ফোন করে আমাকে জানিয়েছিল, ওর একটা পাঁচ লাখ টাকার লাইফ ইনশিয়োরেন্স আছে। সেই পলিসির নমিনি অজু।

বেশ তো, তা হলে আর চিন্তা কী? পলিসিটা কোথায়?

আমার কাছে নেই। সেটা বোধহয় আছে শিখার কাছে।

শিখা! বাঃ বাঃ। শিখা সেই পলিসি আদর করে তোমার হাতে তুলে দেবে বুঝি? বাসুদেব স্কাউড্রেল না হলে পলিসিটা তোমার কাছেই গচ্ছিত রাখতে পারত। এটাও হয়তো ওর একট চালাকি।

বাসুদেব খারাপ হলেও ওর বউ শিখা খারাপ নয়। বাসুদেব আমাকে সে কথা অনেকবার বলেছে। শিখা ধার্মিক মহিলা। বাসুদেব শিখাকেই বলে গেছে, সে মারা গেলে যেন পলিসির টাকা অজু পায়।

তা হলে সেটা আদায় করার চেষ্টা করো। নইলে আমাকে অজুর কাছে সবই খুলে বলতে হবে। আমার বয়স হচ্ছে, এখন আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই। ও ছেলেটা এ বাড়িতে থাকলে আমার পক্ষে পিস অব মাইন্ড বজায় রাখা অসম্ভব। ওকে দেখলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

আমি জানি শঙ্কর। অনেকদিন ধরে তুমি যন্ত্রণাটা আমার মুখ চেয়ে সহ্য করেছ। আর ক'টা দিন সময় দাও। অজু তো নিজেকে তোমার কাছ থেকে সবসময় সরিয়েই রাখে। পারতপক্ষে সামনে আসে না।

তা আসে না, কিন্তু এক ছাদের তলায় তো আমাদের থাকতে হচ্ছে। সেটা আমি আর বরদাস্ত করতে রাজি নই।

হঠাৎ তুমি খেপে উঠলে কেন বলো তো! এতদিন যখন সহ্য করলে তখন আর কয়েকটা দিন পারবে না? তোমাকে বলতে হবে না, অজুকে যা বলার আমিই বুঝিয়ে বলব। আমার সন্দেহ হয়, অজু বোধহয় সব জানেও।

কী করে বুঝলে?

আমি মা। মায়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

জেনে থাকলে ভাল কথা। এটাও ওর জানা দরকার যে, আমার বিষয়-সম্পত্তির কিছুই ও পাবে না। কোনও এক্সপেকটেশন থাকলে সেটা এখনই নিবিয়ে দেওয়া ভাল।

ও কিছু এক্সপেক্ট করে না। ও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। বাসুদেবের পাঁচ লাখ টাকা যদি পায় তা হলে ও এখনই নিজের আলাদা ব্যবস্থা করে নেবে।

শঙ্কর একটু চুপ করে থেকে বলল, তাতেও যে সমস্যা মিটছে তা নয়। আইনের চোখে ও আমারই ছেলে। স্কুলে কলেজে সর্বত্র ওর বাবার নাম শঙ্কর বসু। কাজেই আমি মরলে ও দাবি তুলতে পারে। আমি সেই সম্ভাবনাটাও মেরে দিতে চাই। আমি চাই ওকে লিগ্যালি ডিজওন করতে।

সেটা কীভাবে করবে?

আমার কাছে একটা ডকুমেন্ট আছে।

কীসের ডকুমেন্ট?

তোমাকে লেখা বাসুদেবের একটা চিঠি। অনেকদিন আগে পুনায় একটা অল্পবয়সি ফুটবল টিমের ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। চিঠিটা আমি তোমাকে দিইনি, লেটার বক্সে চিঠিটা পেয়ে নিজের কাছেই রেখে দিই।

একটু চুপ করে থেকে রীণা ক্ষীণ গলায় বলল, কী আছে সেই চিঠিতে?

প্রেমের কথাটথা আছে। রীতিমতো প্যাশনেট চিঠি। তবে যেটা ভাইট্যাল তা হল, অজুর পিতৃত্ব নিয়ে বড়াই আছে। এমন কথাও লিখেছে, কোকিলছানা কাকের বাসায় বড় হয়, কিন্তু কাক তা টের পায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে কাকটা জেনেশুনেই কোকিলছানাকে লালনপালন করছে।

কী বিশ্রী কথা!

বাসুদেবের কাছ থেকে রুচিকর কিছু আশা করাই তো ভুল।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রীণা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আশ্চর্য!

কীসের আশ্চর্য?

তুমি বাসুদেবকে ঘেন্না করো, অজুকে ঘেন্না করো, কিন্তু আমাকে করো না। কেন বলল তো! আমাকেই তো তোমার সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করা উচিত।

আমাদের মধ্যে একথা নিয়ে আলোচনা অনেকবার হয়েছে।

হয়েছে, কিন্তু তবু আমি বুঝতে পারি না। তুমি তো পাথর নও।

আমি ওথেলো হলে তুমি খুশি হতে?

রীণা অন্ধকারে চুপ করে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, না, তা নয়। মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয় জানো?

কী মনে হয়?

মনে হয় তুমিও আমাকে ঘেন্না করো, কিন্তু সেটা বুঝতে দাও না।

শঙ্কর পাশ ফিরে শুয়ে বলল, ঘুমোও রীণা। কালকেই পলিসিটা উদ্ধারের চেষ্টা করো। ওটা ভাইট্যালি ইম্পর্ট্যান্ট। অজুকে লিগ্যালি ডিজওন করতে হলে ওই পলিসিটাও কাজে লাগবে।

তুমি সত্যিই অজুর পরিচয় প্রকাশ করে দেবে?

নয় কেন? সত্য পরিচয়েই তো পরিচিত হওয়া ভাল। আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি।

রীণা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, অনেক ডিভভার্সি মেয়ে সন্তান নিয়েও তো নতুন স্বামীর ঘর করতে আসে। এই তো নীচের ফোর ডি ফ্ল্যাটের রজত রায়ের বউ বিন্দি।

তুমি কি আমাকে এটাও সেরকম বলে ধরে নিতে বলছ।

তোমাকে বলা আমার অন্যায় হবে। কারণ তুমি তো অনেক করেছ। কিন্তু দেখো, বিন্দির আগের পক্ষের দুটো বাচ্চাকেই তো ওর বর অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। ড্যাডি বলে ডাকেও।

শঙ্কর একটু ঝাঝালো গলায় বলল, শোনো রীণা, এ ব্যাপারটা ওরকম নয়। বাসুদেব এবং তুমি যা করেছিলে তা আমার কাছে লুকোওনি পর্যন্ত। দিনের পর দিন তোমরা আমাকে তো অপমানই করেছ।

রীণা এবার সামান্য দৃঢ় গলায় বলল, তুমি ভুলে যেয়ো না, আমি ডিভোর্স চেয়েছিলাম। তুমি হাতে পায়ে ধরে সেটা রদ করেছ। করোনি?

শঙ্কর এক ফুৎকারে যেন নিবে গেল। স্তিমিত গলায় বলল, করেছি।

তোমার কাছে কিছুই গোপন ছিল না শঙ্কর, এতকাল তুমি সব মেনেও নিয়েছ। আজ হঠাৎ বিদ্রোহ করছ কেন? বাসুদেব মারা যাওয়ার পরই কেন এই বিদ্রোহ? এতকাল কেন চুপ করে ছিলে তুমি? বাসুদেবকে কি তুমি ভয় পেতে?

অন্ধকারে শঙ্করের গলাটা বিকৃত শোনাল, ভয়! ওকে ভয় পাব? কেন ভয় পাব ওই–

যে শব্দটা জিবে এসে গিয়েছিল তা বস্তিবাসীর মুখের শব্দ, ভদ্রলোকের নয়। শঙ্কর আজ অবধি অত খারাপ কথা মুখে আনেনি। তার রুচিতে বাধে। তাই শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। সে এটা বোঝে, ঘটনাটা নিয়ে একটা বিতর্ক হলে সে হয়তো জিতবে না। বাসুদেব তো রীণাকে বিয়েই করতে চেয়েছিল। শঙ্করকে ডিভোর্স করতে আটকাত না রীণারও। বাধা তো দিয়েছিল শঙ্করই।

আজ একটু হাঁসফাস করছে শঙ্কর।

রীণা তার কপালে হাত রেখে বলল, তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি শান্ত হয়ে ঘুমোও। এটা মনে রেখো, তুমি একজন মহৎ মানুষ। আমি তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করি। তোমার দিকে তাকিয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

শঙ্কর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর তার শরীরে চাপা কান্নার থরথরানি টের পেল রীণা। নিজেকে উন্মুক্ত করল সে। তারপর জড়িয়ে ধরল শঙ্করকে। কিছুক্ষণ পর একটা সন্ধিতে এল তারা। স্বামী-স্ত্রী প্রত্যাবর্তনের অযোগ্য পয়েন্ট থেকে মাঝে মাঝে এভাবেও ফিরে আসে পরস্পরের কাছে।

পরদিন সকালে রীণা একটা সিদ্ধান্ত নিল। সে শিখার কাছে যাবে। যাওয়া ছাড়া তার আর গতি কী?

তাদের ভাব-ভালবাসার সময়ে বাসুদেব তাকে বলত, দেখো, আমার সঙ্গে বনিবনা হয় বটে, কিন্তু শিখা খুব ভাল মেয়ে। খুব সৎ, দয়ালু এবং বিশ্বাসযোগ্য।

রীণা প্রশ্ন করত, তোমার সঙ্গে বনিবনা হয় না কেন?

আমি তো একটু আউটরেজিয়াস, বড্ড বেশি লাউড অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ। আমার সঙ্গে কম লোকেরই বনে। সে কথা নয়। নিরপেক্ষ বিচার করলে শিখা কিন্তু ভাল মেয়েই। তেমন সুন্দরী নয়, ছলাকলা জানে না, স্টিল শি ইজ অ্যাডোরেবল।

যখন টেলিফোনে বাসুদেব তাকে লাইফ ইনশিয়োরের কথা জানিয়েছিল তখন তার একটা বিচ্ছিরি হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। বলেছিল, অজু আমার ছেলে। তার প্রতি আমার কিছু কর্তব্য ছিল, যা আমি করিনি। আমি একটা পলিসি করেছি পাঁচ লাখ টাকার, বোনাসটোনাস নিয়ে ম্যাচুরিটিতে অনেক টাকা দাঁড়াবে। একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল, কতদিন বাঁচব কে জানে। পলিসিটা শিখার কাছে আছে। তাকে সব বলেছি। আমার কিছু হলে শিখার কাছে ওটা চেয়ে নিয়ে।

রীণা একটু অহংকারের সঙ্গে বলেছিল আমি কেন যাব? আমার কী দায়? শোনো রীণা, শিখার কিছু ত্যাগ আছে তোমার আর আমার জন্য। আমি চাই আমি মরে গেলে অন্তত একবার তোমাদের দেখা হোক। না হয় দু'জনে আমার নিন্দেই কোরো। তবু তোমাদের দেখা হোক।

আজ রীণার আর অহংকারটা নেই। অদূর ভবিষ্যৎ ভেবে ওই পাঁচ লাখ টাকা তার উদ্ধার করা দরকার। এই নাটকটা বাসুদেব কেন করতে গেল তা বুঝতে পারছে না রীণা। পলিসিটা অনায়াসে তাকেই পাঠাতে পারত বাসুদেব। না হলে কোনও অ্যাটর্নির কাছে গচ্ছিত রাখা যেত। শিখার কাছে কেন? শিখার সঙ্গে রীণাকে মুখোমুখি দাঁড় করানোরই বা কোন প্রয়োজন? এসব নাটক রীণার সহ্য হয় না। কিন্তু অজুর মুখ চেয়ে এই নাটকটা তাকে করতেও হবে।

সকাল সওয়া আটটায় অফিসে বেরিয়ে গেল শঙ্কর। অজু ফিরল আটটা চল্লিশে। মুখে ঘাম, গায়ের সাদা টি-শার্ট ভিজে সপসপ করছে। লিভিং রুম থেকে হলঘরে অজুকে দেখতে পাচ্ছিল রীণা। ও কি তার পাপের প্রতীক? পাপই বা বলবে কেন রীণা? পাপ কেন? সে একজনকে একসময়ে সত্যিকারের ভালবেসেছিল। ও তো সেই ভালবাসারই সন্তান।

অজু কিছুক্ষণ খালি গায়ে পাখার নীচে বসে থাকল। তারপর বাথরুমে গেল।

ধীর পায়ে খাওয়ার টেবিলে এল রীণা। রামু খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে। মুখোমুখি চেয়ারে সে বসে রইল চুপচাপ।

হাই মাম্মি। আজও নিরামিষ নাকি?

রীণা একটু থতমত খেল। নিরামিষের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। গত তিন দিন অজু নিরামিষ খাচ্ছে। কোনও প্রশ্ন করছে না। ও কি জানে? সন্দেহটা বড় কাটা কাটা লাগছে বুকের মধ্যে, না জানলেও জানবে। পলিসিটা যদি পাওয়া যায় তা হলে অজুকেই ক্লেম দাখিল করতে হবে। অজু তখন কি প্রশ্ন তুলবে না, বাসুদেব সেনগুপ্ত আমার কে?

পোশাক পরে অজু খেতে এল। একটু গোগ্রাসে খায়।

খেতে খেতে বলল, তোমার মুখটা ক'দিন যাবৎ অশোকবনে সীতার মতো হয়ে আছে কেন মা?

শরীর–

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে অজু ধমকে উঠল, ফের শরীর। শরীর নয়, তোমার মন খারাপ।

খারাপ হলেই বা কী করবি? মন খারাপ তো খারাপ।

অজু একটু হাসল, খারাপ মনকে ভাল করে ফেললেই তো হয়। পৃথিবীর কোনও ঘটনাকেই গুরুত্ব দিয়ো না। জাস্ট ইগনোর এভরিথিং।

তা যদি পারতাম!

আমি কিন্তু পারি।

কী পারিস?

ঘটনাবলিকে উপেক্ষা করতে।

তোর আর ঘটনাবলি কীসের? একটুকু তো বয়স!

বয়সটা ফ্যাক্টর নয়। কম বয়সেই অনেকের কত ঘটনা ঘটে থাকে।

অজু, তুই কবে চাকরি পাবি?

পাবই যে এমন গ্যারান্টি নেই। হোটেল ম্যানেজমেন্টেও যা ছাত্রছাত্রীর ভিড়। তা ছাড়া কোর্সও তো শেষ হতে অনেক বাকি। কেন মা?

তুই চাকরি করলে আমার বুকটা হালকা হয়।

আমার মনে হয় আমার বেশ ব্যাবসার মাথা আছে। কিছু টাকা পেলে ব্যাবসা করতাম।

কীসের ব্যাবসা?

একটা হেলথ ক্লিনিক আর মাল্টিপল জিম।

তোর মাথায় ও ছাড়া কিছু আসে না?

যার যে লাইন। ওটা আমি ভাল বুঝি। ঢাকুরিয়া ইজ এ গুড স্পট। ওখানে করা যবে।

ঢাকুরিয়া! হঠাৎ ঢাকুরিয়ায় কেন?

ওখানে আমার একটা ঠেক আছে।

ঠেক! কীসের ঠেক? বন্ধুর বাড়ি নাকি?

হ্যাঁ।

ভাড়া নেবে না?

অজু হাসল, নাও নিতে পারে।

রীণা একটু দ্বিধা করল। তারপর খুব শক্ত হয়ে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, শোন অজু, এক জায়গায় তোর কিছু টাকা আছে।

জবাবে অজু কিছুই বলল না। একটু কৌতূহলও প্রকাশ করল না। যেন শুনতেই পায়নি এমন নিস্পৃহভাবে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। আঁচিয়ে সে যথারীতি লিভিং রুমে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে কাগজ দেখল।

চলি মা।

আয়।

একা ফাঁকা বাড়ি। এ সময়টায় খারাপ লাগে তার। মেয়ে স্কুল থেকে ফিরলে ততটা লাগে না। মেয়েরও একটি সবসময়ের আয়া আছে। পরমা ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে সামান্য ভাব বিনিময় করে আয়া বাতাসীর সঙ্গে নিজের ঘরে চলে যায়। বাতাসীর সঙ্গেই তার বেশি ভাব।

শিখার সঙ্গে দেখা করার পর্বটা আজই সেরে ফেললে কেমন হয় তাই ভাবছিল রীণা। অপ্রিয় কাজ, কিন্তু অজুর মুখ চেয়ে কাজটা তাকে করতেই হবে। শিখা তাকে অপমান

করবে কি? করুক। শিখার অপমানেও হয়তো তার কর্মফল–যদি তেমন কিছু থাকে–ক্ষয় হোক।

রীণা নিজের ঘরে পোশাক পরতে যাবে বলে উঠছিল, এমন সময়ে রামু কর্ডলেসটা এনে তার হাতে দিয়ে বলল, আপনার ফোন।

আবার সেদিনের লোকটা নাকি? ঠিক এরকম সময়েই তো ফোন করেছিল সেদিন।

কে বলছেন?

একটা ভারী কিন্তু ভারী আকর্ষক পুরুষের গলা বলল, আপনি কি মিসেস রীণা বসু?

এ সে নয়। রীণা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, বলছি। বলুন।

আমি লালবাজার থেকে বলছি। আমার নাম শবর দাশগুপ্ত।

লালবাজার। কী হয়েছে বলুন তো!

কিছু হয়নি। আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

কী দরকার?

কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল। রিগার্ডিং এ ডেথ।

রীণার বুক কেঁপে উঠল। বলল, ও।

আপনি কি আজ খুব ব্যস্ত আছেন?

আমি একটু বেরোচ্ছিলাম। ঠিক আছে, আসুন।

আপনার ফ্ল্যাটে পৌঁছোতে আমার বোধহয় কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট লাগবে।

ঠিক আছে।

পঁচিশটা মিনিট রীণার জীবনের যেন মন্থরতম সময়। সে কফি খেল, খবরের কাগজ বারবার ওলটাল। তারপর ঝুম হয়ে বসে রইল।

শবর দাশগুপ্ত খুব লম্বাচওড়া লোক নয়। তেমন সাজগোজও নেই। পুলিশের ইউনিফর্মের বদলে গায়ে সাদামাটা একটা ক্রিমরঙা হাওয়াই শার্ট আর কালো ট্রাউজার। চোখ দুখানা ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ। লোকটাকে দেখলে একটু যেন অস্বস্তি হয়।

শবর প্রথমেই তার আইডেন্টিটি কার্ড বের করে দেখাল। তারপর বসল।

চা খাবেন?

খাব। আমি খুব বেশি সময় নিচ্ছি মনে করলে নিঃসংকোচে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন।

মৃদু একটু হাসল রীণা। রামুকে চায়ের কথা বলে এসে সোফায় বসল। বলল, এবার বলুন।

কোথায় যাচ্ছিলেন?

আমার এক বান্ধবীর বাড়ি।

বাধা দিলাম তো!

তাতে কী? পরে যাওয়া যাবে।

ম্যাডাম, আমি একটু সমস্যায় পড়ে এসেছি। আপনার কি মনে পড়ে যে, গত তেরো তারিখে সন্ধের পর আপনি কোথায় ছিলেন?

ও মা, ও আবার কী প্রশ্ন?

বিটকেল শোনাচ্ছে?

তেরো তারিখের কথা আজ কি মনে আছে। ছয় দিন তো হয়ে গেল।

আজ নিয়ে ছয় দিন। দেখুন না মনে পড়ে কি না। প্রশ্নটা অবশ্য রুটিন। তবু বলুন।

কার ডেথ-এর কথা বলছিলেন টেলিফোনে?

সেটা পরে।

হ্যাঁ, তেরো তারিখে আমি সন্ধের পর–না মনে পড়ছে না তো।

রামু চায়ের ট্রে নিয়ে এসে ট্রে-টা নিচু হয়ে সেন্টার টেবিলে রাখছিল। ওই অবস্থাতেই বলল, আপনি ছটায় বেরিয়েছিলেন।

রীণা একটু লাল হয়ে বলে, ও হ্যাঁ। ক্লাবে গিয়েছিলাম।

রামু ফের বলল, ক্লাবে নয়।

তা হলে?

সেদিন আপনার বোনঝির জন্মদিন ছিল। আপনি গিয়েছিলেন সল্টলেক- এ।

ও হ্যাঁ।

শবর হঠাৎ বলল, আপনার স্মৃতিশক্তি কি খুব খারাপ?

না তো। আচমকা জিজ্ঞেস করেছেন বলেই বোধহয় কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম।

কীসে গিয়েছিলেন, গাড়িতে?

না। আমাদের একটাই গাড়ি, সেটা আমার স্বামী ব্যবহার করেন। অফিস থেকে ফিরতে ওঁর রাত হয়। আমি ট্যাক্সিতে গিয়েছিলাম।

ক'টার সময় সল্ট লেকে পৌঁছেছিলেন?

একটু দেরি হয়েছিল। আমার উপহার কেনা ছিল না। সেটা কিনতে একটু সময় লেগেছিল। বোধহয় সাড়ে আটটা হয়ে গিয়েছিল পৌঁছোতে।

আপনার একটি মেয়ে আছে, না?

হ্যাঁ। পরমা।

জন্মদিনের নেমন্তন্নে তাকে নিয়ে যাননি?

ফের একটু থতমত খেল রীণা। তারপর বলল, না। ওর একটা ইম্পর্ট্যান্ট পরীক্ষা ছিল পরদিন। ও পড়ছিল।

আপনার স্বামী বা ছেলে?

ছেলে কোথাও যায় না। খুব লাজুক। তা ছাড়া ওরও কীসব কাজটাজ ছিল। তবে আমার হাজব্যান্ড অফিস থেকেই গিয়েছিলেন।

কত রাতে?

উনি বোধহয় আমি পৌঁছোনোর দশ-পনেরো মিনিট পরে পৌঁছোন।

উপহারটা কোথা থেকে কিনেছিলেন?

উপহার। ওঃ হ্যাঁ। গড়িয়াহাট।

কোন দোকান মনে আছে?

ফ্যান্সি স্টোর্স।

সেখান থেকেই কি আপনি সবসময়ে কেনাকাটা করেন?

ঠিক নেই। ওখানেও করি, অন্য দোকান থেকেও করি।

যতক্ষণ কেনাকাটা করছিলেন ততক্ষণ কি ট্যাক্সিটা ওয়েটিং-এ ছিল?

না। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রেজেন্টেশন কেনার পর আবার গড়িয়াহাট থেকে ট্যাক্সি নিই।

তখন ক'টা?

ঠিক খেয়াল নেই। সাড়ে সাতটা হবে হয়তো।

আপনার চাকরটির নাম কী?

ওঃ, ওর নাম, রামু।

এখন যে কথাটা বলব সেটা ওর শোনা উচিত হবে না। আমরা কি আপনার ওই লিভিং রুমে গিয়ে বসতে পারি?

নিশ্চয়ই।

জুতো খুলে যেতে হবে নাকি?

না না, আসুন।

লিভিং রুমে আজও সকালের রোদ্দুর ঝা ঝা করছে। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে প্রাক-শরৎ ঋতুর চমৎকার একটা হাওয়া আসছে ঘরে।

আপনার একটি ছেলে আছে।

হ্যাঁ। অজাতশত্রু। রীণা চোখদুটো নত করল। এর পরের প্রশ্ন কোনদিকে যেতে পারে তা ভেবে তার বুক কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল।

আপনি অভয় দিলে বলি, ছেলেটির জন্মবৃত্তান্ত আমি জানি। আপনার অহেতুক সংকোচের কারণ নেই।

বলুন।

ছেলেটি যে বাসুদেব সেনগুপ্তর সেটা কি আপনার হাজব্যান্ড জানেন?

নতমুখে রীণা বলল, জানেন।

তার সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক কীরকম?

ভালই।

নরম্যাল বলছেন। বাপ আর ছেলের মতোই সম্পর্ক?

হ্যাঁ।

স্কুলকলেজে ছেলের বাবার পরিচয় কি আপনার হাজব্যান্ডের নামেই?

হ্যাঁ।

কিন্তু ইনহেরিটেন্সের ব্যাপারটা? উনি কি আপনার ছেলেকে বিষয়-সম্পত্তির ভাগও দেবেন?

সেটা নিয়ে কথা হয়নি।

কখনও নয়?

না।

বাসুদেব সেনগুপ্ত কি কখনও আপনাকে জানিয়েছিলেন যে, ওঁর একটা মোটা টাকার লাইফ পলিসির নমিনি আপনার ছেলে?

হ্যাঁ।

পলিসিটা বা প্রিমিয়ামের রসিদ বোধহয় আপনার কাছে নেই?

না। ওঁর স্ত্রীর কাছে আছে।

আপনার ছেলে কি খবরটা জানে?

না তো!

ঢাকুরিয়ায় বাসুদেববাবুর একটা পুরনো বাড়ি ছিল, জানেন? মস্ত বাড়ি, অনেকটা জমি নিয়ে।

জানি।

সেই বাড়িটা ভেঙে প্রমোটার ফ্ল্যাট তুলছে, জানেন কি?

শুনেছিলাম।

সেই বাড়ির দোতলায় একটা তেরোশো স্কোয়ার ফুট ফ্ল্যাট অজাতশত্রু বসু নামে কাউকে অ্যালট করা আছে। জানতেন?

রীণা অবাক হয়ে মুখ তুলে বলে, জানতাম না তো!

অজাতশত্রু বসু এখন বেশ সচ্ছল একটি যুবক। অবশ্য যদি এলআইসির টাকাটা আদৌ সে পায়।

রীণা উদ্বিগ্ন গলায় বলে, পাবে না কেন?

পাবে না বলিনি। তবে পাওয়ার ব্যাপারে বাধা আছে। বাসুদেব সেনগুপ্তের ছেলেরা তো ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছে না। তা ছাড়া পলিসির আসল নমিনি শিখাদেবী, অজাতশত্রু প্রাপক, যদি শিখা তাকে দেন।

রীণা হঠাৎ খুব করুণ গলায় বলল, দেখুন, আমার তো কলঙ্কিত জীবন, সবাই জানে। আজ আমার লুকোবারও কিছুই নেই। আমার জন্য অজু কেন বঞ্চিত হবে?

বঞ্চনার কথা কেন বলছেন? অজাতশত্রু তো সুখেই আছে এখানে।

রীণা চোখের জল লুকোনোর চেষ্টা করল না। মাথা নেড়ে বলল, নেই, নেই, সুখে নেই।

কেন বলুন তো!

শঙ্কর ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না। শঙ্কর পরিষ্কার বলে দিয়েছে ওর একটা পয়সাও অজু কখনও পাবে না। অজুকে শঙ্কর ডিজওন করতে চায়।

শবর কিছুক্ষণ রীণার আবেগ প্রশমিত হতে দিল। তারপর বলল, আপনার ছেলে কি জানে?

কী জানার কথা বলছেন?

ও যে বাসুদেব সেনগুপ্তর ছেলে!

না। আমি ওকে কখনও বলিনি।

আপনি না বললেও বলার লোকের তো অভাব ছিল না।

আমি জানি না ও জানে কি না।

ও কি বাসুদেব সেনগুপ্তর পলিসি বা ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটের কথা জানে?

না তো। ফ্ল্যাটের কথা আমিও এই প্রথম শুনলাম।

আপনার ছেলে কখন বাড়িতে থাকে?

একটু আগেই তো বেরোল। সকালে বেরোয়, রাতে ফেরে।

ক'টার সময় ফেরে?

ন'টা-দশটা।

আপনার স্বামী?

উনি খুবই ব্যস্ত মানুষ। উনি আরও সকালে বেরোন, আরও রাতে ফেরেন।

ছুটির দিনে?

ছুটির দিনেও আমার স্বামীর আউটিং থাকে।

আপনার ছেলে?

ওরও আউটিং থাকে। আচ্ছা, একটা কথা বলবেন? আপনি এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন? কী হয়েছে?

বাসুদেব সেনগুপ্তর মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় বলে ওঁর আত্মীয়রা সন্দেহ করেছেন। একটা অফিশিয়াল এনকোয়ারি লোকাল থানা থেকে হচ্ছে। আমি কাজটা আন অফিশিয়ালি একটু এগিয়ে রাখছি।

রীণা শবরের দিকে শুকনো মুখ করে চেয়ে রইল। তার বুকের ভিতরে ঘনিয়ে উঠছে ভয় আর ভয়। গলাটা তার খুবই শুকিয়ে গেছে। একটু গলা খাকারি দিয়ে সে স্তিমিত গলায় বলল, কয়েকদিন আগে–বাসুদেব যেদিন মারা যায় তার পরদিন সকালের দিকে একজন আমাকে ফোন করে এ কথাটাই বলেছিল। সে তার নাম বলেনি।

অ্যাননিমাস কল?

হ্যাঁ।

লোকটা একজাক্টলি কী বলেছিল মনে আছে?

একটু ইয়ারকির ভাব ছিল। বলছিল বাসুদেব নরম্যালি মারা যায়নি। তাকে খুন করা হয়েছে।

লোকটা হয়তো সত্যি কথাই বলেছে।

রীণা চোখ বুজল। তারপর ধরা গলায় বলল, আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন?

সন্দেহই আমাদের ধর্ম ম্যাডাম।

কাকে সন্দেহ করছেন?

সবাইকেই। কনসার্নড কেউই সন্দেহের বাইরে নয়। তেরো তারিখে আপনি সল্টলেক থেকে আপনার স্বামীর গাড়িতেই তো ফিরে আসেন?

হ্যাঁ।

গাড়ি কে চালাচ্ছিল, ড্রাইভার?

না। সেদিন ড্রাইভার ছিল না। শঙ্কর গাড়ি চালাচ্ছিল।

উনি কি স্টেডি ছিলেন?

কেন থাকবেন না?

শবর একটু হাসল, চলি ম্যাডাম। আবার দেখা হতে পারে।

৬. মৃত্যুর মুখ থেকে ঘোষাল ফিরল

মৃত্যুর মুখ থেকে ঘোষাল ফিরল। ফিরত না, যদি না শবর ঝাঁপিয়ে পড়ত ডাক্তার এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর। সামান্য অবহেলা, সামান্য দেখভাল এবং সময়োচিত ব্যবস্থার নড়চড় হলেই মারা পড়ত ঘোষাল। শবর সেটা হতে দেয়নি।

তিনদিন বাদে ঘোষালের বেডের পাশে সকালে দাঁড়িয়ে ছিল শবর।

কীরকম আছেন?

দুর্বল গলায় নিস্তেজ ঘোষাল বলল, বাঁচাটা বাঁচার মতো না হলে বেঁচে কী লাভ?

বেঁচে থাকাটাই লাভ। আপনি মরলে যে আরও দুটি প্রাণী ভেসে যায়।

সে আর কী করা যাবে। আমি বেঁচে থাকতেও কি যাবে না?

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।

ঘোষাল মৃদু একটু হাসার চেষ্টা করল, গীতা?

নয় কেন? আমি রোজ পড়ি।

তাতে জোর পান?

পাই। খুব পাই। গীতা আমার চোখ খুলে দেয়, মাথা থেকে অনেক চিন্তার ভূত তাড়িয়ে দেয়।

আগে পড়েছি কয়েকবার। আজকাল আর হয়ে ওঠে না।

রোজ গীতা পড়ুন ঘোষালবাবু, ইট উইল হেল্প। হতো বা প্রান্স্যসি স্বর্গং জিহ্বা বা ভোক্ষসে মহীম। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়।

যুদ্ধ! আমার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে মিস্টার দাশগুপ্ত। আই অ্যাম এ রুইনড ম্যান।

ওরকম মাঝে মাঝে মনে হয়। আপনি রুইনড ম্যান নন, আপনি উইক ম্যান। আর সেটার কারণ আপনার অত্যধিক পুত্রস্নেহ।

পুত্রস্নেহ কি দুর্বলতা?

না। পুত্রস্নেহ কার নেই? কিন্তু তা থেকে অকারণ উদ্বেগ, অশান্তি টেনশন হলে বুঝতে হবে আপনি শক্ত মানুষ নন, অবসেসড।

ওরা যদি আমার ছেলেকে মেরে ফেলত? কী হত তা হলে বলুন। তার চেয়ে চাকরি যাওয়া ভাল।

আপনি কেসটা ঝেড়ে ফেললেন, আপনার ছেলেও বেঁচে গেল। কেমন তো! এবার বলুন, এইসব ক্রিমিন্যালরা যদি টিকে থাকে তা হলে আরও কতজনের ছেলে বিপন্ন হবে। আপনার পর যে-অফিসার কেসটা হাতে পাবে তারও হয়তো ছেলেমেয়ে আছে, তাকেও ওরা হয়তো ওরকম হুমকি দেবে। তার মানে কি আমরা সবাই একে একে হাত গুটিয়ে নেব?

আপনি লজিকের কথা বলছেন। লজিক আমি মানছি, কিন্তু আমি এ কাজের অযোগ্য। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি দুর্বল।

ঘোষালবাবু, বিপদ কি একবার আসে? কিছু মনে করবেন না, আপনি আজ নয় চাকরি ছাড়লেন, কিন্তু কাল যদি আর একটা গ্যাং আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ চায়

তখন কী করবেন?

অ্যাঁ! বলে বড় বড় চোখ করে ঘোষাল তাকাল।

এরকম তো হতে পারে!

পারেই তো। আর এইসব টেনশনের জন্যই তো আমি মরতে চেয়েছিলাম। বেঁচে থাকার যোগ্যতাই আমার নেই!

ছেলের কথা ভেবেই না হয় বেঁচে থাকুন। আপনি না বাঁচলে তার যে কোনও প্রোটেকশন থাকবে না।

না থাকুক। তখন তো আমিও থাকব না, টেনশনও থাকবে না।

তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে তা জানেন?

কী?

তার মানে আপনি একজন সেলফিস ম্যান। ছেলেকে নয়, আপনি ভালবাসেন নিজেকে। নিজের টেনশন, নিজের উদ্বেগ, নিজের দুর্বলতা থেকে মুক্তি চান বলেই আপনি এসব করছেন। নইলে মাত্র আট বছরের একটা ছেলেকে পিতৃহীন করে রেখে যেতে আপনার মনুষ্যত্বে বাধত।

প্লিজ, মিস্টার দাশগুপ্ত। এসব কথা আমি এখন সহ্য করতে পারছি না।

ও কে। আমি আপনাকে আর ডিস্টার্ব করব না। শুধু জানিয়ে যাই, ওই কেসটা কর্তৃপক্ষ সুধাংশু দাসকে দিয়েছে। সুধাংশুরও একটি আট বছরের ছেলে আর দু'বছরের মেয়ে আছে।

ও!

আরও একটা কথা। আপনার রেজিগনেশন লেটারটা আমি সরিয়ে নিয়েছি। আপনি আপাতত অফিসে পেপারওয়ার্ক করবেন, ফিল্ডে যেতে হবে না। বলে-কয়ে এটুকু আমি করতে পারব। ঠিক আছে?

ঘোষাল কোনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না। ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে থেকে বলল, একটা গীতা দেবেন?

সঙ্গে তো নেই। বিকেলে পাঠিয়ে দিতে পারি।

ঘোষাল গভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

ভয়! ভয় নিয়েই ভাবছে শবর ক'দিন ধরে। এখানকার মানুষ কেন এত ভয়-ভীতির শিকার? পৃথিবীতে এখন সুস্পষ্ট দুটো দল, ভীত আর ভীতিপ্রদ।

গোপালকে তার দ্বিতীয় দলের বলেই মনে হল, যখন তাকে বেলা এগারোটায় তার ঢাকুরিয়ার বাড়িতে মুখোমুখি পেল শবর। আজ রবিবার। গোপাল তাই বাড়িতেই ছিল।

আপনি কী করেন?

আমার ফ্রিজ আর এয়ার কন্ডিশনার সারাইয়ের একটা ব্যাবসা আছে ল্যান্সডাউনে।

এ বাড়ি কি আপনার নিজের?

না মশাই, ভাড়া বাড়ি।

নিজস্ব কিছু নেই?

নেই বলি কী করে? হালতুর দিকে ইন্টিরিয়রে দু' কাঠা জমি কিনেছি। কাকা তো আমাদের পথে বসিয়েই গেছে, জানেন তো!

খানিকটা জানি।

আমাদের এজমালি বাড়ি, কাকা নিজের নামে করেছিল। কথা ছিল পরে সকলের নামেই দলিল হবে। টালবাহানা করছিলেনই, শেষে আড়াই লাখ টাকার ফ্যাকড়া তুলে আমাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করলেন। কী ফল হল বলুন। নিজেই তো টেসে গেলেন।

মামলা করেছিলেন আপনারা?

করে কী লাভ? ওঁর নামে দলিল। মামলা করলে উকিলের পকেট ভরত, আর কিছু হত না।

ঝগড়াঝাটি হয়েছিল?

হবে না? একটা জোচ্চোর লোক সব গাপ করে নেবে, আমরা চুপ করে থাকব?

আপনি কি কখনও ওঁকে খুনের হুমকি দিয়েছিলেন?

দেখুন মশাই, ওরকম পরিস্থিতি হলে হুমকি আপনিও দিতেন, প্রমোটারকে যখন কাকা বাড়িটা দিয়ে দিলেন তখন আমরা গিয়ে বললাম, কাকা, আমাদের তো পথেই বসালেন, এবার প্রমোটারকে অন্তত বলুন যাতে আমাদের দুটো ফ্ল্যাট দেয়। উনি তাতে এমন চেঁচামেচি করতে লাগলেন যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। কার রক্ত ঠান্ডা থাকে বলুন! আমরা আবার বরিশালের বাঙাল, রক্ত একটু গরম। আমি তখন বলেছিলাম, আপনার লাশ নামানোর ব্যবস্থা করছি, দাঁড়ান।

উনি তখন কী করলেন?

উনি একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে এসেছিলেন। সঙ্গে অকথ্য গালাগাল। হুমকিতে টলার পাত্র তো ছিলেন না।

উনি যেদিন মারা যান সেদিন আপনি ওঁর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন।

যাব না কেন? শত হলেও কাকা তো। বাবাকেও বঞ্চিত করেছিলেন, তবু বাবা কেঁদেকেটে একশা।

আপনারা কি পুরনো দাবি আবার তুলবেন?

তুলে খুব একটা লাভ হবে না। তবে কাকিমা লোক ভাল। উনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন। হয়তো কিছু কমপেনসেট করতে চান।

তেরো তারিখে–অর্থাৎ বাসুদেববাবু যেদিন মারা যান সেদিন সন্ধে সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?

গোপাল একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে বলে, কেন বলুন তো।

আপনি কি মনে করতে পারবেন?

সন্ধেবেলা আমি তো দোকানেই থাকি। কাজকর্ম থাকে। অনেক রাত অবধি দোকানেই থাকতে হয়।

সেদিনও ছিলেন?

হ্যাঁ।

ঠিক মনে আছে?

আছে।

আপনার দোকানে কতজন কর্মচারী?

তিনজন।

তারাও সেদিন সন্ধেবেলা ছিল?

ওরা ছ'টার মধ্যে চলে যায়। বেশি রাত পর্যন্ত আমি একাই থাকি।

আপনি কি ড্রিঙ্ক করেন? গোপাল হাসল, আমরা মিস্ত্রি মানুষ, খাটতে-পিটতে হয়।

একটু-আধটু খাই।

সেদিন ক'টা অবধি দোকানে ছিলেন?

এগারোটা হবে।

আপনার গাড়ি আছে?

স্কুটার আছে।

আপনি কি জানেন যে, আপনার কাকার মৃত্যুটা একটু অস্বাভাবিক?

জানি। লিফট খারাপ ছিল বলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়।

ঠিক কথা। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেদিন লিফট খারাপ ছিল না।

তা হলে?

কেউ ওটা সাজিয়েছিল যাতে বাসুদেববাবুকে বাধ্য হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়।

গোপাল স্পষ্টতই অস্বস্তিতে পড়ে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তার মানে কি কাকাকে খুন করা হয়েছে?

সেরকমই সন্দেহ।

সর্বনাশ। আপনি কি সেজন্যই জেরা করছেন?

হ্যাঁ। তবে ঘাবড়াবেন না। এটা রুটিন প্রসিডিওর।

গোপাল ভয় পেল কিনা বোঝা গেল না। তবু বলল, লাশ নামানোর হুমকিটার কথা ভেবেই কি সন্দেহ করছেন আমাকে? ওরকম হুমকি তো লোকে রেগে গেলে কতই দেয়।

সেটা আমরা জানি। আর একটা প্রশ্ন।

বলুন।

আপনার কাকার একটি অবৈধ ছেলে আছে, জানেন?

জানি। আরও থাকতে পারে।

তার মানে?

কাকা উওম্যানাইজার ছিলেন। বহু মহিলার সঙ্গেই সম্পর্ক ছিল। সুতরাং আরও দু-একটা থাকা বিচিত্র নয়।

আপনি কি এরকম আর কোনও ছেলেমেয়ের কথা জানেন?

না, আন্দাজে বলছি।

আন্দাজটা উহ্য রাখবেন। একজনের কথা তো জানেন।

হ্যাঁ। অজাতশত্রু বসু। কাকা ঢাকুরিয়ার বাড়িতে তার নামে একটা ফ্ল্যাট দিয়েছেন। শুনছি একটা মোটা টাকার পলিসির নমিনি করে গেছেন।

ছেলেটিকে আপনি চেনেন?

না মশাই। খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কাকার অবৈধ ছেলের খোঁজ করব।

আপনি কি শুনেছেন যে, আপনার কাকার শ্রাদ্ধ তার ছেলেরা করতে রাজি হচ্ছে না?

তাও জানি। আমি পরশুদিনই তো কাকিমার কাছে গিয়েছিলাম। উনি খুব কান্নাকাটি করলেন। আমরা ভাবছি, অর্ক আর বুদ্ধ যদি না করে তা হলে আমি কালীঘাটে গিয়ে করে আসব। আমার বাবা আমাকে বলেছেন, শ্রাদ্ধ না করাটা ঠিক হচ্ছে না।

বাসুদেববাবুর সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

মাস তিন-চার আগে বোধহয়।

তখন কী কথাবার্তা হয়েছিল?

গোপাল হাসল, কী আর হবে! কাকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো মধুর ছিল না।

আপনার দোকানের কর্মচারীরা কতদিনের পুরনো?

কেন বলুন তো!

বলুন না!

বেশ পুরনো। বছর দশেক তো হবেই।

তারা বিশ্বাসী?

হ্যাঁ।

আপনার আর্থিক অবস্থা কীরকম?

মোটামুটি। চলে যায় আর কী।

কাকার মৃত্যুতে আপনি কোনওভাবেই লাভবান হয়েছেন কি?

না মশাই, আর কোনও আশা নেই।

এই যে বললেন, কাকিমা কমপেনসেট করতে চান। কাকার মৃত্যুতে তো সেটাই আপনার লাভ।

গোপাল উদাস গলায় বলল, কাকিমা আর কতই বা দেবে? হয়তো বিবেকের দংশন এড়াতে পাঁচ-দশ হাজার অফার করবে। তাও যদি অর্ক আর বুদ্ধ দিতে দেয়। আমি অবশ্য ঠিক করেছি, পাঁচ-দশ হাজার দিতে চাইলে নেব না। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব কেন মশাই? ঢাকুরিয়ার বাড়ির ভ্যালুয়েশন জানেন? অন্তত ত্রিশ লাখ টাকা। বাবারা তিন ভাই। ভাগ করলে পারহেড দশ লাখ করে পড়ে।

বুঝেছি।

আমাদের জ্বালাটাও বুঝবার চেষ্টা করুন।

শবর একটু হেসে উঠে পড়ল। বলল, আবার হয়তো দেখা হবে।

অজাতশত্রুকে পাওয়া গেল তার জিম-এ হাজরা রোডে তাদের ফ্ল্যাটের কাছাকাছিই বেশ ঝা চকচকে আধুনিক মাল্টিপল জিম। কালো শর্টস পরা গায়ে সাদা তোয়ালে জড়ানো অজাতশত্রু একটি ফুটফুটে কিশোরীর পাশে বসে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছিল। মুখে ঘাম।

কিশোরীটিকেও লক্ষ করল শবর। তারও পরনে শর্টস, গায়ে একটা ঢিলা কামিজ। মাথায় থোপা থোপা কোকড়া চুল বয়কাট করা। ছিপছিপে, নাতিদীর্ঘ, তেজি চেহারা।

শবর বিনা ভূমিকায় অজাতশত্রুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

ছেলেটা অবাক হয়ে চাইল। বলল, আমার সঙ্গে!

হ্যাঁ। এখানে নয়, বাইরে যেতে হবে।

কেন? কী দরকার?

শবর পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে তার চোখের সামনে মেলে ধরে চাপা স্বরে বলল, লালবাজার।

অজাতশত্রুর মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবে সে উঠে পড়ল। মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল, ও কে, বাই...

বাই।

শবর বলল, পোশাকটা পালটে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অজাতশত্রু বেরিয়ে এল। গায়ে টি-শার্ট পরনে ট্রাউজার্স, কাঁধে ব্যাগ।

চলুন।

জিপে ড্রাইভারের সিটে বসে শবর অজাতশত্রুকে পাশে বসাল। বলল, কথা বলার পক্ষে এটাই বোধহয় ভাল জায়গা। নাকি আপনাদের ফ্ল্যাটেই যেতে চান?

অজাতশত্রু গম্ভীর মুখে বলল, এটাই ভাল।

ভণিতা না করেই জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি আপনার পিতৃপরিচয় জানেন?

অজাতশত্রু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, এখন জানি।

কতদিন আগে জানতে পারেন?

গতকাল। মা আমাকে বলেছে।

জেনে আপনার রি-অ্যাকশন কী?

খারাপ লেগেছে।

আপনি আপনার মায়ের ওপর রেগে যাননি?

না, তবে দুঃখ পেয়েছি। লজ্জা হয়েছে।

শঙ্করবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম?

ভালই।

ভাল বলতে?

সো সো। এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন কেন করছেন?

ব্যক্তিগত প্রশ্নও মাঝে মাঝে করতে হয়। আপনি বাসুদেব সেনগুপ্তকে চিনতেন?

হ্যাঁ। আমি ছেলেবেলায় ওঁকে দেখেছি।

উনি আপনাদের বাড়িতে আসতেন?

হ্যাঁ।

তখন আপনার কিছু মনে হত না?

দশ বারো বছর আগেকার কথা, ভাল মনে নেই।

দশ-বারো বছর উনি কি আর আসেননি?

না!

এই দশ বারো বছরের মধ্যে বাসুদেবের সঙ্গে আপনার কখনও দেখা হয়নি?

কী করে হবে? বললাম তো, উনি আসতেন না।

গতকাল যখন শুনলেন যে, উনিই আপনার বাবা তখন কি ওঁর ওপর আপনার রাগ বা ঘেন্না হল?

অজু কিছুক্ষণ পাথরের মতো বসে থেকে বলল, একটা মিক্সড ফিলিং। ঠিক বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছিল যেন আমার আইডেন্টিটিটাই হারিয়ে যাচ্ছে। না রাগ নয়, হেপলেসনেস।

আপনি কি জানেন যে, বাসুদেব সেনগুপ্ত আপনার জন্য একটা ফ্ল্যাট এবং পাঁচ লাখ টাকার একটা পলিসি রেখে গেছেন!

কাল মায়ের কাছে শুনলাম।

শুনে কীরকম রি-অ্যাকশন হল?

অজু একটা করুণ হাসি হেসে বলল, এসব তো কমপেনসেশন। কিন্তু আমার হেপলেসনেসটা তাতে কমছে না।

যদিও আপনি তখন ছোট ছিলেন, তবু বলুন বাসুদেব সেনগুপ্তকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হত?

একটু ডিস্টার্কিং লাগত। উনি প্রায়ই এসে বিকেলের দিকে বসে থাকতেন। বাইরের কোনও লোক রোজ এলে কি ভাল লাগে?

ওঁর সঙ্গে আপনার কি কথাবার্তা হত?

না। উনি 'র সঙ্গে কথা বলতেন।

আপনার সঙ্গে কখনও বলতেন না?

হয়তো কখনও এক-আধটা বলেছেন, কিন্তু এটা মনে আছে যে, আমি ওঁদের কাছে বড় একটা যেতাম না।

লোকটা সম্পর্কে আপনার কখনও কোনও সন্দেহ হয়নি?

সন্দেহ নয়, একটু বিরক্ত বোধ করতাম হয়তো।

আপনি যখন কাল শুনলেন যে বাসুদেব সেনগুপ্তই আপনার বাবা তখন কি মায়ের ওপর আপনার কোনও রিপালশন হল?

কেন হবে! আজকাল একস্ট্রা ম্যারিটাল রিলেশন তো কোনও ব্যাপার নয়।

নয়?

অজু একটু লজ্জা পেয়ে বলে, ব্যাপার ঠিকই, তবে এরকম তো হতেই পারে। হি ওয়াজ এ স্পোর্টসম্যান অ্যান্ড পারসোনেবল অলসো।

আপনি আপনার মাকে তা হলে ক্ষমা করেছেন?

মাকে আমি খুব ভালবাসি।

আর শঙ্করবাবুকে?

উনি একজন চমৎকার ভদ্রলোক।

বাবা হিসেবে?

বাবা হিসেবেও খারাপ নন।

তেরো তারিখে সন্ধে সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে সাতটা আপনি কোথায় ছিলেন?

প্রশ্নটা ভাল করে শেষ হওয়ার আগেই চটজলদি জবাব দিয়ে ফেলল অজু, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে একটা স্পোর্টস প্রোগ্রাম দেখছিলাম ভিডিয়ো-তে।

এত দ্রুত জবাবে একটু অবাক শবর বলল, বন্ধুটি কে?

মাণ্ডবী ঘোষ। উডবার্ন পার্কে থাকে। ওই যে মেয়েটির সঙ্গে আমি একটু আগে কথা বলছিলাম।

ওদের বাড়িতে আর কে কে থাকে?

মা-বাবা।

আর কেউ নয়?

না।

ওইদিন ওর মা-বাবা বাড়িতে ছিলেন?

না। ওঁরা বেরিয়েছিলেন।

তা হলে বাড়িতে ছিলেন শুধু আপনি আর মাণ্ডবী?

হ্যাঁ। উই আর চামস।

বাড়িতে কোথাও কাজের লোকটোক নেই?

আছে। তবে তারা সব ঠিকে। সন্ধের আগেই চলে যায়।

কখন গিয়েছিলেন?

ছ'টা নাগাদ।

ক'টা অবধি ছিলেন?

আটটা।

আপনাকে কেউ ও-বাড়িতে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছে?

তা কী করে বলব?

বাড়ি না ফ্ল্যাট?

বাড়িই বলতে পারেন। দোতলা একটা বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরটা নিয়ে ওরা থাকে।

দোতলায় কারা আছে?

সাম সিন্ধি পিপল।

বাড়িটা কি মাণ্ডবীদের?

না। ওরা ভাড়া থাকে। অনেকদিনের পুরনো ভাড়াটে।

মাণ্ডবীর ভাইবোন নেই?

না। শি ইজ অ্যান ওনলি চাইল্ড।

শবর একটু হাসল। তারপর বলল, আপনি কি জানেন বাসুদেববাবু কীভাবে মারা গেছেন?

শুনেছি।

কী শুনেছেন?

মৃত্যুটা স্বাভাবিকভাবে হয়নি।

হ্যাঁ। ওঁর হার্ট খারাপ ছিল। লিফট খারাপ বলে উনি সিঁড়ি ভেঙে উঠছিলেন।

মা সব বলেছে। ইউ আর আফটার দি ম্যান।

ম্যান। উওম্যান নয়?

ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, মেয়েরা কি ওসব করে?

কে জানে! আমার পুলিশি অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে।

হতে পারে। মে বি এ উওম্যান।

আপনি হোটেল ম্যানেজমেন্ট শিখছেন?

হ্যাঁ।

প্রসপেক্ট কীরকম?

বুঝতে পারছি না। সব লাইনেই তো ভিড়।

তা হলে পড়ছেন কেন?

কী করব? একটা কিছু করার চেষ্টা তো করতে হবে।

আপনার কি অন্য কিছু করার ইচ্ছে?

ইচ্ছে থাকলেই বা লাভ কী?

কেন, আপনি তো একটা বেশ বড় ফ্ল্যাট আর পাঁচ লাখ টাকার মালিক।

সেটা তো আগে জানতাম না।

জানতেন না?

না। কী করে জানব? ইটস অ্যান আউটরেজিয়াস কোশ্চেন।

ফরগেট ইট। আপনি তো খেলাধুলো করেন বলে শুনেছি।

করি।

কোন ক্লাব?

স্পোর্টিং ইউনাইটেড।

অজিত ঘোষ বলে কাউকে চেনেন?

না। সে কে?

ঢাকুরিয়ার যে বাড়িতে আপনার নামে বাসুদেব সেনগুপ্ত একটা ফ্ল্যাট রেখে গেছেন সেই বাড়ির প্রমোটার।

না, চিনি না। ফ্ল্যাটের কথা তো কালই জানলাম।

অজিতবাবু কিন্তু অন্য কথা বলেন।

তার মানে?

অজিতবাবু বলেছেন আপনি সেই ফ্ল্যাটের কনস্ট্রাকশন দেখতে গত এক বছরে বেশ কয়েকবার সেখানে গেছেন। ইন ফ্যাক্ট, আপনার ডিরেকশন অনুযায়ী ফ্ল্যাটের ভিতরকার কিছু অল্টারেশনও হয়েছে।

অজু বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ বসে রইল। জবাব দিতে পারল না।

অজিতবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আপনার বায়োলজিক্যাল বাবা বাসুদেব সেনগুপ্ত।

অজু এবারও চুপ। মুখটা নোয়ানো।

শবর একটা শ্বাস ফেলে বলল, এসব লুকিয়ে কোনও লাভ আছে কি অজাতশত্রুবাবু?

অজু ধীরে মুখটা তুলে শবরের দিকে ফিরে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন। লজ্জা আর সংকোচের বশে আমি কথাটা গোপন করছিলাম।

নাউ, আউট উইথ দি ফ্যাক্টস, প্লিজ।

আমি যখন স্কুলে এইট-নাইনে পড়ি তখনই একদিন উনি আমার সঙ্গে স্কুলের বাইরে দেখা করেন। আমি ওঁকে চিনতাম, কিন্তু বাবা বলে জানতাম না। উনি সেদিন আমাকে একটা ভাল রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। তারপর আমাকে একটু রেখে ঢেকে ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জানালেন। উনি বলেছিলেন, আমি ওঁরই ছেলে, তবে আমাকে উনি অনেকটা দত্তক হিসেবে শঙ্কর বসু ও রীণা বসুর কাছে দিয়েছেন।

কথাটা আপনি বিশ্বাস করেছিলেন?

না। কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমার সন্দেহ ছিল, উনি আমার মায়ের সঙ্গে ইনভলভড্। আরও আশ্চর্যের কথা, উনি বলার আগে থেকেই কিন্তু আমার প্রায়ই এ সন্দেহও হয়েছে। যে, আমি ওঁরই সন্তান।

কীভাবে সন্দেহটা হল?

আমার বাবা অর্থাৎ শঙ্কর বসুর আমার প্রতি আচরণ থেকে। তা ছাড়া আমি ওঁদের কথাবার্তা কিছু কিছু ওভারহিয়ারও করতাম। সোজা কথা ব্যাপারটা আমার কাছে গোপন ছিল না। তাই উনি যখন কথাটা বললেন তখন আমি একটুও অবাক হইনি।

তারপর কী হল?

উনি মাঝেমধ্যেই আমার সঙ্গে দেখা করতেন। আমি খেলাধুলোয় ভাল বলে উনি নানাভাবে আমাকে ইন্সপায়ার করেছেন। ক্লাবে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারেও সাহায্য করেছেন।

যতদূর শুনেছি উনি ঠিক এরকম স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন না। নিজের পুত্র-কন্যাদের প্রতি ওঁর আচরণ ছিল জঘন্য। কাজেই আপনার প্রতি উনি এত নরম হলেন কেন?

তা ঠিক বলতে পারব না। উনি যে রাগী আর মেজাজি মানুষ ছিলেন তা আমি খানিকটা জানি। মনে হয় আমার পরিবারে আমি খানিকটা আনওয়ান্টেড বলেই উনি একটু সিমপ্যাথেটিক হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে আমার বাবা শঙ্কর বসু আমাকে একদমই পছন্দ করেন না। তাই আমি ছেলেবেলা থেকেই পারতপক্ষে ওঁর মুখোমুখি হই না। এটা উনি জানতেন।

শবর চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, হতেও পারে।

উনিই আমাকে বলেছিলেন, ওঁর একটা পাঁচ লাখ টাকার পলিসি আছে যার নমিনি আমি।

কিন্তু উনি পলিসিটা আপনার বা আপনার মা'র হাতে না দিয়ে সেটা নিজের স্ত্রীর কাছে জমা রাখলেন কেন?

মাথা নেড়ে অজু বলল, তা জানি না। তবে আরও দু'বছর পর পলিসিটা ম্যাচিওর করত। উনি এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন বলে হয়তো ভাবেননি।

এই পলিসিটা উদ্ধার করার জন্য আপনি কিছু করেননি?

না। তবে আমার মা হয়তো শিখাদেবীর কাছে যাবে।

আপনার কথা কি শিখাদেবী জানতেন?

হ্যাঁ।

কী করে বুঝলেন?

বাবা-অর্থাৎ বাসুদেব সেনগুপ্তই আমাকে সেকথা বলেছিলেন।

আপনি কি বাসুদেববাবুকে বাবা বলেই ডাকতেন?

অজু হাসল, ডাকে কী আসে যায়?

জাস্ট কৌতূহল।

না। উনিও চাননি সেটা।

তবে কী বলে ডাকতেন?

ডাকার দরকার হত না। মুখোমুখি কথা হত আমাদের। তাও মাঝে মাঝে। না, ওঁকে বাবা বলে ডাকার কোনও প্রয়োজন হয়নি।

বাবা বলে ভাবতেন কি?

তা ভাবতাম। যা সত্য তাকে অস্বীকার করে লাভ কী? তা ছাড়া উনি তো আমার বেনিফ্যাক্টর ছিলেন।

শবর অন্যমনস্কভাবে বলল, ওঁর মৃত্যুতে আপনি প্রচুর লাভবান হয়েছেন।

৭. আমি রীণা

আমি রীণা।

শিখা বিহ্বল চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, বাঃ, তুমি দেখতে বেশ সুন্দর তো! এখনও আর একবার বিয়ে দিয়ে আনা যায়।

আপনি কি কিছু কম সুন্দর! লক্ষ্মী প্রতিমার মতো মুখ। আমি কি আপনাকে একটা প্রণাম করতে পারি?

তুমি কেন এসেছ তা জানি। প্রণাম করতে হবে না।

বোসো। রীণা বসল। মাথাটা উদ্ভ্রান্ত। বুকের ভিতরে একটু গুড়গুড়। হয়তো অপমানিত হতে হবে। হয়তো উনি বের করে দেবেন।

শিখা প্রায় নিষ্পলক চোখে তাকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, লজ্জা পাচ্ছ?

রীণা মুখ নত করে বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে বলল, উনি আপনার খুব প্রশংসা করতেন।

শিখা মৃদু একটু হেসে বললেন, তাই নাকি? আমার আবার কীসের প্রশংসা? লেখাপড়া তেমন শিখিনি, গুণও বিশেষ কিছু নেই। সেইজন্যই তো–

বলে কথাটা আর শেষ করলেন না শিখা।

গরিব-দুঃখী-পঙ্গু-আতুরদের ওপর আপনার খুব মায়া, শুনেছি।

ও কিছু নয়। যখন ঢাকুরিয়ার বাড়িতে ছিলাম তখন অনেক গরিব-দুঃখী আসত বটে। তেমন কিছুই করে উঠতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, কাউকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েও দিতাম না। এলে দু'দণ্ড জিরোতে দিতাম, সুখ-দুঃখের কথাও বলতাম। জানো তো, অনেক দুঃখী আছে যারা ঠিক টাকাপয়সা বা ভিক্ষের জন্য আসে না, দুটো মনের কথা বলে জুড়োতে আসে।

রীণা শিখার দিকে একটু অবাক চোখে চেয়ে থাকে। ইনি কি একজন সত্যিকারের মহীয়সী মহিলা?

শিখা একটা সুস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আটতলার ফ্ল্যাটে এসে দেখো কেমন বাক্সবন্দি হয়ে গেছি। কোনও দুঃখী আতুর কি এখানে আসতে পারে? আমার একদম ইচ্ছে ছিল না, উনি জোর করে এলেন। সারাদিন আমার যে কী একা লাগে তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। সারাদিন লোকজন না দেখে হাঁফিয়ে পড়ি।

রীণার বিস্ময় বাড়ছে। সে এঁরই স্বামীকে একদা কেড়ে নিয়েছিল প্রায়। গর্ভে ধারণ করেছিল তার সন্তান। সে এসেছে পাঁচ লাখ টাকার দাবি নিয়ে। তবু এই মহিলা তার সঙ্গে এমন বন্ধুর মতো কথা বলছেন কী করে?

শিখা বললেন, আমি তো নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। এবার তোমার কথা বলো।

রীণা মাথা নিচু করে বলল, আমার তো বলার কিছু নেই। আমি শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি।

আমাকে দেখতে এসেছ! আমাকে দেখার কিছু নেই। তোমার কথা বলো।

আমার তো আপনার মতো কোনও গুণ নেই। বরং আমার অনেক দোষ অনেক পাপ। শিখা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর খুব ধীর স্বরে চাপা গলায় বললেন, তুমি আমার

সতিন হলে এক কথা ছিল। কিন্তু এ তো তা নয় ভাই। জানি এ যুগে মেয়েরা কিছু মানতে চায় না। কিন্তু সেটা কি ভাল?

এখন মনে হয়, ভাল নয়।

এখন মনে মনে কত কষ্ট পাচ্ছ তুমি। তোমার জন্য আমার মায়া হচ্ছে। মনের কষ্টের মতো কষ্ট নেই।

এইসব মায়াভরা কথায় রীণার চোখে জল আসছিল। সে মুখ তুলে শিখার দিকে চাইতে পারছিল না।

শিখা খুব নরম গলায় বলল, উনি মারা যাওয়ার পর তুমি কি তোমার ছেলেটাকে অশৌচ পালন করিয়েছ?

রীণা মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলল, না। ও তো সম্পর্কটা জানত না তাই সাহস পাইনি। তবে কয়েকদিন নিরামিষ খেয়েছিল।

আমি কিন্তু ওসব খুব মানি। আমার বয়স উনষাট। তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। তা ছাড়া শুনেছি তুমি বড়লোকের বউ। তুমি কি আর অত আচার বিচার মানতে পারো? তবু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। বলব?

বলুন।

উনি তোমার ছেলের নামে যে লাইফ ইনশিয়োরেন্স পলিসিটা রেখে গেছেন সেটার কথা জেনে আমার দুই ছেলে খেপে গেছে। এতটাই খেপেছে যে তারা ঠিক করেছে বাপের শ্রাদ্ধ করবে না। অনেক বুঝিয়েছি, চোখের জল ফেলেছি, কাজ হয়নি। ওদের ধনুক ভাঙা পণ। একেই তো বাপকে বিশেষ পছন্দ করত না, তার ওপর আবার এই ব্যাপার। ওরা না করলেও শ্রাদ্ধটা হয়তো আমিই করব। কিন্তু কী মনে হয় জানো, শ্রাদ্ধাধিকারী তো বড় ছেলে। নিদেন ছোট ছেলেও করতে পারে। তোমার ছেলেকে দিয়ে ওঁর শ্রাদ্ধটা করাবে?

আপনি যদি বলেন, করাব।

বেশি আয়োজন করতে হবে না। লোকজন নেমন্তন্ন করার তো কথাই ওঠে না। যদি কালীঘাটে নিয়ে করাও তা হলেও হবে। একটা ছেলের হাতের জলটুকু যদি পান তা হলেই অনেক।

ঠিক আছে। করাব।

পলিসিটা তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু টাকা আদায় করা খুব সহজ হবে না। ডেথ সার্টিফিকেটের কপি আর আরও কীসব লাগবে যেন। সেসব ওই অফিস থেকেই বলে দেবে। শুনেছি অনেক ঝামেলা।

আমিও শুনেছি।

শিখা উঠে ভিতরের ঘরে গেলেন। একটু বাদেই পলিসিটা এনে রীণার হাতে দিয়ে বললেন, উনি এটা আমাকে কেন দিয়েছিলেন জানো? যাতে তুমি একদিন আমার কাছে আসতে বাধ্য হও। উনি একটু অদ্ভুত মানুষ ছিলেন, তা তো জানোই!

জানি।

টাকাটা আদায় করো, তারপর ছেলেটাকে ভালভাবে মানুষ করো। কেমন হয়েছে তোমার ছেলেটা?

চুপচাপ থাকে। খেলাধুলো নিয়েই থাকে বেশি।

বাপের মতোই।

আমি কিন্তু এবার আপনাকে একটা প্রণাম করব।

কেন, এখনই চলে যাবে? কিছু মুখে দেবে না? অন্তত একটু চা বা শরবত?

না থাক। আপনাকে আর উঠতে হবে না।

আমার কাজের লোক আছে, ভয় নেই।

শিখা একজন মাঝবয়সি কাজের মেয়েকে ডাকলেন। সে এসে দাঁড়ালে বললেন, রোদে তেতেপুড়ে এসেছে ওকে একটু ঘোলের শরবত দে। রীণা, তুমি ঠান্ডা খাও তো!

খাই।

তা হলে বরফ দিস বাতাসী। একটুকরো।

রীণা পলিসির সার্টিফিকেটটা তার ব্যাগে পুরল। কৃতজ্ঞতায় তার মনটা ভরে যাচ্ছিল।

শিখা নরম গলায় বললেন, সম্পর্কটা শেষ করে দিয়ো না। মাঝে মাঝে এসো। আমি তো একা থাকি।

আস্ব দিদি।

ঘোলের শরবত এল ঝকঝকে কাঁচের গেলাসে। ঘোলের ওপর সবুজ লেবুপাতার টুকরো ভেসে আছে, আর বরফের কুচি। চমৎকার স্বাদ।

শিখা হঠাৎ বললেন, আমি শুনেছি তোমার বর তোমাকে খুব ভালবাসেন!

রীণা মাথাটা নোয়াল।

লজ্জা কীসের? স্বামীর ভালবাসা যে পাচ্ছ সেটা ভগবানের দয়া বলে মনে কোরো। তোমার বর খুবই ভাল লোক বলতে হবে।

হ্যাঁ, উনি ভীষণ ভাল।

আমার স্বামী ভালবাসতে জানতেন না। বরং অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেতেন। এ ধরনের লোককে বোধহয় স্যাডিস্ট বলে, না?

তাই হয়তো হবে।

সেজন্যই ওঁর সত্যিকারের নিজের লোক কেউ হল না। ছেলেরা নয়, মেয়ে নয়, কেউ নয়। শুধু আমি ছিলাম। কষ্ট আমাকেও কিছু কম দেননি। কিন্তু আমার তো উপায় ছিল না।

রীণা মুখ তুলতে পারছে না। ভয় হচ্ছিল, পুরনো কথা যদি উঠে পড়ে।

শিখা উদাস গলায় বললেন, এখন তো শুনছি ওঁর মৃত্যুটাও এমনি হয়নি। পুলিশ নানারকম সন্দেহ করছে। কী জানি বাপু, সত্যিকারের কী হয়েছিল।

ঘরের আবহাওয়াটা একটু ভারী হয়ে যাচ্ছিল। রীণা আর বসে থাকতে পারছে না। সে উসখুস করছিল।

শিখা বললেন, উঠবে? এসো তা হলে। ওঁর ডেথ সার্টিফিকেটটার কপি দরকার হলে আমাকে জানিয়ো। জেরক্স করিয়ে রাখব।

রীণা ঘাড় হেলিয়ে উঠে পড়ল। এত সহজে এবং অল্প আয়াসে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে বলে সে ভাবেনি। সে সত্যিকারের শ্রদ্ধার সঙ্গে শিখাকে একটা প্রণাম করে বেরিয়ে এল। বাসুদেব ভুল বলেনি। শিখা সত্যিই খুব ভাল মহিলা।

বাড়ি ফিরতে বেলা একটা হয়ে গেল। রীণা এসি চালিয়ে বাইরের ঘরে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল।

পরমা এসে বলল, কোথায় গিয়েছিলে মা? তোমার একটা ফোন এসেছিল।

কার ফোন?

চিনি না। মোটা গলা। আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করছিল।

কী কথা?

তোমার কথা।

কী কথা?

প্রথমে জিজ্ঞেস করল তুমি কোথায় গেছ। তারপর জিজ্ঞেস করল, আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা, বাপির সঙ্গে তোমার ঝগড়া হচ্ছে কিনা, তুমি কেমন মানুষ।

ও মা! এসব আবার কী কথা! কে লোকটা?

নাম বলেনি। তবে দেড়টার সময়ে আবার ফোন করবে।

ঠিক আছে। তুমি স্নান করতে যাও।

সামান্য নার্ভাস লাগছিল রীণার। এ হয়তো সেই লোকটাই যে আরও একদিন ফোন করেছিল। যে-ই হোক, লোকটা অনেক খবর রাখে।

দেড়টা নয়, লোকটা ফোন করল দুটোর পর। সেই ভারী, মোটা গলা।

মিসেস বোস?

হ্যাঁ।

আপনার মতো লাকি উওম্যান আমি আর দেখিনি। কংগ্রাচুলেশনস।

তার মানে?

এটা যে কলিযুগ তা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়। কলিযুগে যারা পাপটাপ করে তাদেরই রবরবা। আপনি এত কিছু করেও দিব্যি সুখে আছেন। শুনছি আপনার ছেলেটির জন্য নাকি বাসুদেব সেনগুপ্ত পাঁচ লাখ টাকা আর একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থাও করে গেছে। মিসেস বোস, একেই বলে গাছের খাওয়া আর তলার কুড়োনো।

আপনি ভদ্রলোক নন?

আজ্ঞে না। ভদ্রলোক হলে আপনার সঙ্গে এসব রসালাপ করতে পারতাম কি?

আমি ফোন ছাড়ছি।

সেটা আপনার ইচ্ছে। তবে কথা বললে আলটিমেটলি আপনার হয়তো লাভই হবে।

দেখুন, আমার জীবনটা আমার একারই। আপনি হয়তো জানেন না, আমি আমার স্বামীর কাছে ডিভোর্সও চেয়েছিলাম। উনি দেননি। সুতরাং আমার খুব একটা দোষ নেই। আপনি অকারণ বিবেকের ভূমিকা নিচ্ছেন কেন? আপনি কে?

বাঃ, এই তো দেখছি, মানসিকভাবে অনেকটা সামলে উঠেছেন। নিজের ফেবারে সাজিয়ে গুছিয়ে যুক্তিও খাড়া করছেন। তবে সেদিন ওরকম মিউ মিউ করছিলেন কেন?

আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?

কথার কি শেষ আছে ম্যাডাম? শুধু বলি, আপনি ভাগ্যবতী মহিলা বটে, কিন্তু আপনার স্বামী শঙ্কর বসু একটি আস্ত পাঁঠা। অ্যাডাল্টারাস উওম্যান জেনেও আপনাকে মহারানির মতো লোকটা পালপোষ করছে কীভাবে? ওর গায়ে কি মানুষের চামড়া নেই?

প্লিজ! আপনি এসব বন্ধ করুন।

লোকটা একটা ঘিনঘিনে হাসি হেসে বলল, বিবেকের দংশন হচ্ছে নাকি?

প্লিজ!

আপনি আগের দিন আমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। আমাকে বিবেক বলেই জানবেন।

আপনি আর দয়া করে ফোন করবেন না। বিশেষ করে আমার দুধের বাচ্চা মেয়েটার কাছে আপনি যেসব কথা জানতে চেয়েছেন তা অন্যায়।

আপনার মেয়ে কি একদিন তার মায়ের কথা জানতে পারবে না?

হয়তো জানবে। বড় হোক, আমিই জানাব।

আপনার মতো মহিলা আমি সত্যিই দেখিনি মিসেস বোস। আপনার ভাগ্য অন্য মেয়েদের কাছে ঈর্ষণীয়।

৮. শঙ্করবাবু, তেরো তারিখে

শঙ্করবাবু, তেরো তারিখে বিকেলবেলা ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আপনার হোয়ার অ্যাবাউটস কী ছিল?

অ্যাম আই এ সাসপেক্ট?

এভরিওয়ান ইজ এ সাসপেক্ট। বলুন।

ইউজুয়ালি ছ'টার পর আমার মিটিং থাকে।

সেদিনও ছিল?

ছিল।

কার সঙ্গে এবং ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত?

শব্দহীন নিজস্ব মস্ত চেম্বারে আরামদায়ক একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে শঙ্কর একটু ভাবল। উলটোদিকে বসা মাঝারি চেহারার শবর দাশগুপ্ত লোকটিকে তার ভাল লাগছে না। এ একজন অল্প বেতনের গোয়েন্দা। এর কি তার সঙ্গে ওপরওয়ালার মতো কথা বলার স্পর্ধা থাকা উচিত?

শঙ্কর বলল, মনে নেই। আমার সেক্রেটারি হয়তো জানে।

আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি। দরকার হলে সেক্রেটারির সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে।

সরকার যে কেন এইসব পাতি গোয়েন্দাদের হাতে এত ক্ষমতা দেয় তা বোঝে না শঙ্কর। সে অত্যন্ত তেতো গলায় বলল, মনে না থাকলে কী করা যাবে? আমি ব্যস্ত মানুষ, রোজই মিটিং টিটিং করতে হয়–

আপনি কতটা ব্যস্ত সে খবর আমার জানা আছে। এত বড় একটা কোম্পানির আপনি রিজিওন্যাল ম্যানেজার, ব্যস্ত তো থাকারই কথা। তবু তেরো তারিখটা একটু মনে করার চেষ্টা করুন। সেদিন সল্টলেকে আপনাদের একটা নেমন্তন্ন ছিল।

হ্যাঁ।

ওই অকেশনটা থেকে চিন্তাকে একটু পিছিয়ে নিতে থাকুন, মনে পড়বে।

শঙ্কর একটু ভাবল। তারপর বলল, সেদিন আমার ড্রাইভার ছিল না। তাই আমি বোধহয় একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে যাই।

ড্রাইভারের কী হয়েছিল?

কী একটা দরকারে ছুটি নিয়েছিল।

ইট ক্যান বি ক্রস চেকড। যা বলার ভেবেচিন্তে বলুন।

তাই তো বলছি।

একটু আগে বেরিয়ে গিয়ে কী করলেন?

একটা উপহার কেনার দরকার ছিল। তাই–

উপহার কার জন্য?

আমার শালির মেয়ের জন্য। ওর জন্মদিন ছিল।

আপনারা স্বামী-স্ত্রী কি দুতরফা উপহার দিয়েছিলেন?

তার মানে?

আপনার স্ত্রীও সেদিন উপহার কিনেছিলেন বলে আমাকে বলেছেন।

ওঃ!

উপহারটা কোথা থেকে কিনলেন?

নিউ মার্কেট।

কী কিনেছিলেন?

ঝুটো গয়না।

বাসুদেব সেনগুপ্তকে আপনি কতকাল চেনেন?

অনেকদিন।

কীরকম লোক ছিলেন তিনি?

সেটা উহ্যই থাকা ভাল।

তেরো তারিখে আপনি ক'টার সময় অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন?

ছ'টা–না আরও পরে।

ঘড়ি না দেখে বেরোবার মানুষ তো আপনি নন।

বলেছি তো, ভাল মনে পড়ছে না।

নিউ মার্কেটের কোন দোকান থেকে গয়না কিনেছিলেন মনে আছে?

দোকানের নামটাম জানি না। না, মনে নেই।

ইতিমধ্যে আমি সল্টলেকে আপনার শালির বাড়িতে খোঁজখবর নিয়েছি। ওঁরা জানিয়েছেন, ওঁদের মেয়ের জন্মদিনে তাকে আপনারা পাঁচশো টাকার একটা গিফট চেক দিয়েছেন। সেই চেকটা কেনা হয়েছিল বারো তারিখে।

ওঃ।

শঙ্কর বড্ড অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। নিজেকে এমন বোকা তার বহুকাল লাগেনি। গোয়েন্দারা কীভাবে কাজ করে এবং কত দূর অবধি খোঁজখবর নেয় সে সম্পর্কেও তার ধারণা ছিল না। সে শবর দাশগুপ্তর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল।

এবার বাসুদেব সেনগুপ্তর প্রসঙ্গ। মিস্টার বোস, আমার কাছে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, আমি আপনার স্ত্রী ও বাসুদেববাবুর সম্পর্কের কথা জানি। আমার প্রশ্ন হল, আপনি যখন দেখলেন ওঁরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছেন, তখন আপনি আপনার স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়ে তার অবৈধ প্রেম মেনে নিলেন কেন?

এটা খুবই ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার। আপনি ঠিক বুঝবেন না।

আমি এও শুনেছি, আপনি আপনার স্ত্রীকে ভীষণ ভালবাসেন। এতটাই সেই ভালবাসা যে, তার সমস্ত অন্যায় ও ব্যভিচার অম্লান বদনে মেনে নেন। সত্যিই কি তাই?

শঙ্কর একটু লাল হয়ে বলল, হয়তো ভালবাসাটা একটা যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নয়। তবুবলি, কথাটা সত্যি। আমি আমার স্ত্রীকে প্রবলভাবে ভালবাসি।

ভালবাসা ইউজুয়ালি পজেসিভ। আপনার স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখেও আপনি তেমন কোনও ব্যবস্থা নেননি। কেন তা বলতে পারেন?

কী ব্যবস্থা নেব? আমার তো কিছু করার ছিল না।

আপনি আপনার স্ত্রী বা বাসুদেবকে কখনও চার্জ করেননি?

করে কী হবে? দে ওয়্যার ইন লাভ, আমার কিছু করার ছিল না।

সাধারণত প্রেমিক পুরুষেরা জেলাস হয়। স্ত্রীর প্রেমিককে তারা বড় একটা ক্ষমা করে না। বাসুদেবকে আপনি কিছুই করেননি। মারপিট না হোক একটা শো-ডাউন বা একটা ঝগড়া তো করবার চেষ্টা করতে পারতেন।

তাতে লাভ হত না।

আপনি কি মোর ক্যালকুলেটিভ দ্যান ইমোশনাল?

আমি আমার ইমোশন কন্ট্রোল করতে পারি।

তাই যদি হয় তা হলে আপনি আপনার স্ত্রীকে ডিভোর্স না করার জন্য কান্নাকাটি এবং সাধাসাধি করলেন কী করে? দ্যাট ইজ ইমোশন। তাই না?

এসব কথা আপনাকে কে বলল? আমার স্ত্রী?

তা ছাড়া আর কে হতে পারে?

রীণা যদি ও কথা বলে থাকে তবে খুব একটা ভুল বলেনি। হ্যাঁ, আমি ওকে ছাড়তে চাইনি। সেই সময়ে আমি আবেগে খানিকটা ক্যারেড হয়ে গিয়েছিলাম–সত্যি কথা।

বাসুদেব সেনগুপ্তকে কি আপনি ভয় পেতেন?

হঠাৎ শঙ্কর রাগে লাল হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, স্টপ ইট। কেন-কেন আমি সেই স্কাউন্ড্রেলটাকে ভয় পাব? আমি ওকে ঘেন্না করতাম।

প্লিজ! ওরকম হেস্টি হবেন না। এসব অনভিপ্রেত প্রশ্ন আমাদের বাধ্য হয়েই করতে হয়। আপনি নিজেই বলেছেন যে, আপনি আপনার ইমোশনকে কন্ট্রোল করতে পারেন।

সরি। বলুন।

ভয়ের প্রশ্নটা উঠছে তার কারণ বাসুদেব সেনগুপ্ত খুবই মারকুট্টা এবং অ্যাগ্রেসিভ লোক ছিলেন। খেলার মাঠেও ওঁর মারাকু বলে বদনাম ছিল। নিজের পরিবারের কাছেও ছিলেন একজন ভীতিপ্রদ মানুষ।

তা জানি।

এবার বলুন ওঁর সঙ্গে লাইন অফ কলিশনে আসতে কি আপনার একধরনের উইকনেস ছিল?

সামান্য সাদা মুখে কিছুক্ষণ বসে রইল শঙ্কর। তারপর জোর করে মাথা নেড়ে বলল, না।

ওই আকস্মিক রক্তহীনতা শবর চেনে। ঘোষালবাবুর ঠিক ওরকমই হয়েছিল। তবে শবর পয়েন্টটা নিয়ে আর চাপাচাপি করল না।

এবার একটু সেনসিটিভ প্রশ্নে যাচ্ছি।

শঙ্কর একটা শ্বাস ফেলে বলে, গো অ্যাহেড।

রিগার্ডিং অজাতশত্রু বসু।

হ্যাঁ। অজু বাসুদেবের ছেলে।

সেটা এখন অনেকেই জানে। প্রশ্ন হল, এ ছেলেটির প্রতি আপনার মনোভাব কেমন?

কীরকম হওয়া উচিত?

আমার প্রশ্ন হল, বাসুদেব অন্যায়কারী হলেও ছেলেটি তো ইনোসেন্ট।

শুনুন, আমি রক্তমাংসের মানুষ, পাথর নই। আমি আমার স্ত্রী আর বাসুদেবের অনেক অন্যায় সহ্য করেছি বটে, তা বলে বাসুদেবের ছেলেকে মাথায় করে নাচবার তো কিছু নেই।

তা বলছি না। আমার প্রশ্ন, ছেলেটার প্রতি আপনার এত তীব্র বিদ্বেষ ছিল কেন, যার জন্য ছেলেটা কখনও আপনার সামনে আসার সাহস পেত না?

আপনার নিজের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটলে বুঝতেন আমি কতটা মানসিক সাফারার।

কখনও প্রতিশোধ নেওয়ার কথা মনে হয়নি?

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ কীভাবে নেব তা আমি ভেবে পেতাম না।

প্রতিশোধের কথা ভাবতেন তো? বাসুদেবকে খুন করার ইচ্ছে কখনও হয়নি?

ফের উত্তেজিত হয়ে শঙ্কর বলে ওঠে, আর ইউ হিন্টিং সামথিং?

ঠান্ডা গলায় শবর বলল, এরকম ইচ্ছে তো হতেই পারে। বিশেষ করে যারা অসহায় আর দুর্বল, যারা ভিতু তাদের মনেই জিঘাংসা থাকে বেশি। যেহেতু তারা ঘটনা ঘটাতে পারে না সেইহেতুই তারা মনে মনে খুনটুনের কথা ভাবে। শুধু ভাবেই, তার বেশি কিছু নয়।

আপনি আমাকে দুর্বল আর ভিতু বলে ব্র্যান্ডেড করছেন নাকি? আর ইউ শিয়োর?

শবর মাথা নেড়ে বলে, না। আই অ্যাম নট শিয়োর। কিন্তু এবার একটা আরও সেনসিটিভ প্রশ্ন আছে। ভয় হচ্ছে প্রশ্নটা করলে আপনার ভায়োলেন্ট রি-অ্যাকশন হতে পারে। করব কি?

ইফ দ্যাট ক্লিয়ার্স মি ফ্রম দিস হিনিয়াস অ্যাফেয়ার্স দেন শুট।

দেন পুল ইয়োরসেলফ টুগেদার। প্রশ্নটার জবাব ইচ্ছে করলে আপনি নাও দিতে পারেন।

গো আহেড।

আপনার যৌন ক্ষমতা কি কিছুটা কম ছিল?

চেয়ারের দু'হাতলে শঙ্করের দু' হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। মুখটা হয়ে গেল পাথরের মতো। দুই চোয়ালে দুটো ঢিবি। চাপা হিংস্র গলায় সে বলল, হোয়াট ডু ইউ মিন? এটা কী ধরনের–

রিল্যাক্স। আই হ্যাভ গট দি মেসেজ।

হোয়াট মেসেজ, ইউ বাস্টার্ড?

শবর একটু হাসল। ঠান্ডা নরম গলাতেই বলল, ইট হার্টস আই নো।

ক্লান্ত শঙ্কর নিজের ব্যবহারে সামান্য লজ্জিত হয়ে বলে, এসব অবান্তর প্রশ্ন করছেন কেন?

অবান্তর নয় বলেই করছি। আমি হোমওয়ার্ক না করে আপনার কাছে আসিনি।

কীসের হোমওয়ার্ক?

রসকো ক্লিনিকের ডাক্তার চৌধুরী আমাকে জানিয়েছেন, আপনি তার রেগুলার ক্লায়েন্ট। একসময়ে আপনি তার কাছে হরমোন ট্রিটমেন্টের জন্য গিয়েছিলেন।

শঙ্করের মুখটার বয়স যেন চোখের পলকে দশ বছর বেড়ে গেল। স্তম্ভিত এবং হতশ্বাস একটা চেহারা। ঢাকা দেওয়া গেলাস তুলে খানিকটা জল খেল ঢক ঢক করে।

এতে লজ্জার কী আছে? এরকম তো হতেই পারে। সকলের কি সব দিক পারফেক্ট থাকে?

প্লিজ! আজ আপনি আসুন।

কেন উত্তেজিত হচ্ছেন? আমি পুলিশে চাকরি করি বলেই মায়াদয়াহীন নই। কিন্তু সত্যের ভিতরে পৌঁছোতে হলে এসব বিচ্ছিরি প্রসঙ্গ না তুলেও উপায় থাকে না।

আমি ইম্পোটেন্ট নই।

ইম্পোটেন্ট বলিনি।

তা হলে?

ডাক্তার চৌধুরী আমাকে বলেছেন, ইউ ওয়্যার নট এ ভেরি উইলিং অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ লাভার। ওঁর একটা ব্যাখ্যা আছে।

কী সেটা?

আপনি আপনার সুন্দরী স্ত্রীকে অত্যধিক ভালবাসতেন। এতটা ভালবাসতেন বলেই আপনি তাকে সেয়ালি খুশি করতে পারবেন কি না তা নিয়ে আপনার টেনশন থাকত। এটা একধরনের ভয়। এই ভয় এতটাই তীব্র যে ইন রিয়ালিটি আপনি দুর্বল হয়ে পড়তেন। স্ত্রীকে তৃপ্ত করা আপনার পক্ষে সম্ভব হত না।

শঙ্কর মুখটা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

খুব সরু এবং নিচু গলায় শবর বলল, এই সুযোগটাই কি বাসুদেব নিতেন?

প্লিজ! প্রসঙ্গটা আমার সহ্য হচ্ছে না।

কেন মিস্টার বোস, আমি তো বন্ধুর মতোই আপনার সঙ্গে কথা বলছি। আমি আপনার শত্রু নই। আমি আপনার প্রবলেমগুলো নিয়ে ভেবেছি বলেই এত খবর নিয়েছি। ডাক্তার চৌধুরী আপনাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছেও পাঠিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ।

মিস্টার বোস, সেক্সের শতকরা আশি- নব্বই ভাগই হল মানসিক, দশ বা কুড়ি পারসেন্ট হল শরীর। একটা মোটিভেশন থেকেই ওটা হয়ে ওঠে।

ক্লান্ত শঙ্কর বলল, আপনি কি আমাকে যৌনশিক্ষার পাঠ দিচ্ছেন?

শবর একটু হাসল, বলল, না। লেট ইট গো। আপনি একজন অপমানিত, লাঞ্ছিত মানুষ। আপনার স্ত্রী এবং বাসুদেব মিলে আপনাকে একসময়ে সহ্যের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। আপনার স্ত্রী আপনাকে একরকম জানিয়েই বাসুদেবের সন্তান ধারণ করেন। আপনি সবই মেনে নিয়েছিলেন, সহ্য করেছিলেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা একটা মহত্ত্বের ব্যাপার। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে, পৌরুষের অভাব।

ধরুন তাই। নাউ লেট মি গো হোম।

শঙ্কর উঠতে যাচ্ছিল। শবর ঠান্ডা এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।

শঙ্কর গা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ে বলল, ইউ আর গোয়িং টু ফার।

আমি সেটা জানি। আপনি হয়তো তখন প্রতিশোধ নেননি, কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে বাসুদেবের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছেন।

কী বলছেন আপনি? শঙ্কুর ফের সাদা মুখে বলল। তার হাত ফের চেয়ারের হাতলে শক্ত।

শবর হাসল, নানারকম সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। এরকম নাও হতে পারে। তেরো তারিখে বিকেল ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা অবধি আপনার হোয়ারঅ্যাবাউটস জানাটা সেজন্যই জরুরি।

বললাম তো!

কিছুই বলেননি। যা বলেছেন তা ভাসাভাসা। ইনি ডিটেলস যদি বলতে না পারেন তবে ইউ আর ইন এ স্যুপ।

মাই গড!

শঙ্কর দৃশ্যতই ভেঙে পড়ার ভঙ্গি করে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল।

শবর মৃদুস্বরে বলল, কোথায় ছিলেন?

আই হ্যাড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

কার সঙ্গে?

সেটা বলা যাবে না।

দরকার হলেও না?

এখনও দরকারটা বুঝতে পারছি না।

শবর উঠল। বলল, ওকে। লেট আস কল ইট এ ডে!

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় একবার ফিরে চাইল শবর। দেখল, যেন নিজেরই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে আছে শঙ্কর বসু।

রাত ন' টায় হাসপাতালে হানা দিল শবর। ভিজিটিং আওয়ার অনেকক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে। এখন হাসপাতালটা বেশ শান্ত।

ঘোষাল বিছানায় উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে বসে গীতা পড়ছিল। তাকে দেখে ছোট বইটা বালিশের পাশে রেখে উঠে বসে হাসল।

শবর বিছানারাই এক ধারে বসে বলল, শুনলাম আপনার রিলিজ অর্ডার কালই হয়ে গেছে। তবু আপনি বাড়ি যাচ্ছেন না কেন?

মায়ার বন্ধন একটু আলগা করার চেষ্টা করছি।

বুঝিয়ে বলুন মশাই।

আমি এসেনশিয়ালি একজন ফ্যামিলিম্যান। ছেলেবউ এদের নিয়ে জড়িয়ে জেবড়ে থাকতে ভালবাসি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই অত্যধিক মায়ার বন্ধনটা পৌরুষের পক্ষে ক্ষতিদায়ক। আমার ইদানীং হোমসিকনেসটাও বেড়ে গিয়েছিল খুব। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে তর সইত না। তাই ভাবছি আরও দু-চার দিন ফ্যামিলি থেকে একটু তফাত থাকি।

এ কি গীতা পাঠের ফল নাকি?

ঘোষাল হাসল, তাও বলতে পারেন, অ্যাকচুয়ালি তাই।

ভাল। কিন্তু তার চেয়েও ভাল কাজেকর্মে নেমে পড়া। কর্মের মতো মুক্তির পথ আর নেই।

তা বটে। সেটাও ভাবছি। আপনার কেসটার খবর কী?

সেই সেনগুপ্ত মার্ডার কেস?

হ্যাঁ। কিন্তু কাগজে তো দিচ্ছে না কিছু।

কাগজে দেওয়ার মতো ব্যাপার নয়। সূক্ষ্ম ব্যাপার, রগরগে ঘটনা তো নয়। এখনও খুবই গোপন তদন্ত চলছে।

কেন?

শবর একটু হাসল, কারণ আছে। এ কেসটা থেকে কী বেরোয় তা আমিও জানি না।

ফ্যাক্টসগুলো আমাকে বলুন না। খানিকটা শুনেছি। বাকিটাও শুনি। একটা জিগস পাজল খেলি।

শুনবেন?

হ্যাঁ। বলুন।

শবর গোটা ঘটনাটা বলল। প্রায় কিছুই বাদ দিল না। খুব মন দিয়ে শুনল ঘোষাল।

শোনার পর ঘোষাল হঠাৎ বলল, রীণা বোসকে ফোনটা কে করছে বলে মনে হয়?

শবর একটু হাসল, আপনিই বলুন।

ঘোষাল একটু হাসল। বলল, ডিডাকশন করলে যা দাঁড়ায় তাতে একজনই হতে পারে। লাভ-হেট রিলেশনে যে লোকটা বরাবর.দু'ভাগ হয়ে ছিল। কখনও ভালবেসে, কখনও ঘেন্না করে। দুটোই তীব্রভাবে করে। লোকটা শঙ্কর বসু।

এই তো মস্তিস্ক চমৎকার কাজ করছে!

শঙ্কর বসুর অ্যালিবাই আছে?

না, কারও কোনও ফুলপ্রুফ অ্যালিবাই নেই।

ছেলেটা?

তারও নেই। মাণ্ডবী বলে তার একটি ফুটফুটে বান্ধবী আছে। শি উইল ভাউচ ফর হিম।

ঘোষাল একটু হাসল, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ইউ নো সামথিং। অ্যালিবাই নেই বলে নিশ্চিন্ত থাকতেন না, ক্র্যাকডাউন করতেন। আপনার লাইন অফ অ্যাকশন আমি জানি।

শবরের মুখ থেকে হাসিহাসি ভাবটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। চুপ করে একটু ভাবল সে। তারপর বলল, লোক দুটো কে হতে পারে বলুন তো।

কোন দুটো লোক?

যারা লিফট সারানোর নাম করে বাসুদেব সেনগুপ্তকে সিঁড়ি ভাঙতে বাধ্য করেছিল।

ঘোষাল মিটিমিটি একটু হেসে বলল, আপনি ইচ্ছে করলেই তাদের খুঁজে বের করতে পারেন।

কী করে বুঝলেন?

আপনার মুখ দেখে। আপনি তেমন চিন্তিত নন। কেন নন মিস্টার দাশগুপ্ত?

শবর একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, ঘোষালবাবু, ইউ আর এ ভেরি কানিং কপ। কেন যে অমন গুটিয়ে গিয়েছিলেন।

বললাম তো, মায়া। মায়া থেকে স্নায়ুদৌর্বল্য। স্নায়ুদৌর্বল্য থেকে ত্রাস। ত্রাস থেকে কর্মনাশ।

দু'জনেই হাসল।

শবর বলল, এখন কী মনে হচ্ছে?

নিজেকে সবসময়েই বলছি, ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

আপনার ছেলেটা আপনার খুব ন্যাওটা, না?

হ্যাঁ। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। ভাবছি, আমার ছেলে বলি বটে, কিন্তু ও তো আমার ক্রিয়েশন নয়। আমার ভিতর দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে মাত্র, আমি সৃষ্টি করিনি। আসলে ও কার

ছেলে শবরবাবু? আমরা কার ছেলে?

শবর হাসল, গীতা পড়ে তো বিপদ করলেন মশাই! এ যে তীব্র বৈরাগ্য। ঘোষাল মাথা নেড়ে বলল, সিরিয়াসলি বলছি, বড্ড মায়ায় মাখামাখি হয়ে আছি যে। সত্যটা কী বলুন তো!

৯. এমনিতেই রাতে ঘুম হয় না শিখার

এমনিতেই রাতে ঘুম হয় না শিখার। শরীরে বড় কষ্ট। খোলসটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভিতরে কতটা ফোপরা হয়ে গেছে। সয়ে যেতে হবে। আর ক'টাই বা দিন! কষ্টটা কি খারাপ লাগে শিখার? কষ্ট খারাপ ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও কি পরিশোধনের কাজ হয় না? হয় বলেই শিখা কষ্টের কথা কাউকে বলেন না। মনের কষ্টও কি কম? যতদিন বেঁচে থাকা ততদিন কত আপনজন পর হয়ে যাবে, কত বিশ্বাসী ভেঙে দেবে বিশ্বাস, কত স্নেহের ধন ধরবে রুদ্রমূর্তি, কত চেনা হয়ে যাবে অচেনা। এসব কি মেনেই নেননি শিখা। ঘর করেছেন এক ভৈরবের। কত খোঁচা, কত উন্মাদ রাগ, কত লাঞ্ছনা আর অপমান সইতে হয়েছে জীবনে। ছেলেরা পালিয়ে বাঁচল, মেয়ে বাঁচল বরের ঘরে গিয়ে। তার তো পথ ছিল না পালানোর। যেন বাঘের খাঁচায় নিরস্ত্র বাস করতে হল। বাঘের ছায়াটুকু সম্বল করে। এখনকার মেয়েরা নারীমুক্তির কথাটথা গলা ছেড়ে বলে। তারা পড়েনি তো কখনও এরকম মানুষের পাল্লায়। মনের কষ্টের শেষও নেই। গতকাল দুই ছেলে এসে তুমুল ঝগড়া করে গেছে তার সঙ্গে। ঝগড়া বলা ভুল, ওদের ছিল একতরফা আক্রমণ। শিখা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তার অপরাধ, লাইফ ইনশিয়োরেন্স পলিসিটা তিনি রীণাকে দিয়ে দিয়েছেন। ঢাকুরিয়ার বাড়ির প্রমোটারের দেওয়া সাত লাখ টাকার সবটাই তিনি ভাশুরদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ছেলেদের তাই নিয়ে আক্রোশ। শিখা ওদের কী করে বোঝাবেন যে, দুনিয়ার সম্পদ দু'হাতে কেড়ে নিলেই হয় না। মানুষের শাপ লাগে। শিখা জানেন, ছেলেরা আর সহজে এমুখো হবে না। বাপের শ্রাদ্ধ করল না, শিখা মারা গেলে হয়তো শিখার শ্রাদ্ধও করবে না। তা না করে না করুক। শিখা কি তা বলে পারেন এত বড় বঞ্চনাকে মেনে নিতে?

সব খারাপের মধ্যে একটাই ভাল খবর। দিন দশেক আগে বাসুদেবের শ্রাদ্ধের দিন সন্ধেবেলায় শিখা বাইরে গিয়ে রীণাকে টেলিফোন করেছিলেন।

রীণা খুব খুশি হয়েছিল ফোন পেয়ে। বলল, দিদি, আপনি যা বলেছেন তাই করেছি।

কী করেছ?

অজুকে দিয়ে এ ক'দিন প্রায় অশৌচের মতোই পালন করিয়েছি, পুরোটা পারিনি। ধড়া বা হবিষ্যিটা হয়ে না উঠলেও নিরামিষ খেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, কাল ঘাট কাজের দিন নিজেই গিয়ে কালীঘাটে ন্যাড়া হয়ে এসেছে। আজ কালীঘাটে গিয়ে শ্রাদ্ধও করেছে। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম।

বাঁচালে। জানি না বাপু শ্রাদ্ধ করলে বা না করলে কী হয়, কিন্তু মনটা বড় খচখচ করছিল। কী বলে যে তোমাকে আশীর্বাদ জানাব ভেবে পাচ্ছি না।

আপনি কি জানেন দিদি, আপনার মতো ভাল মানুষ আমি জীবনে কমই দেখেছি।

পাগল! আমি ভাল কি না তা আমিই জানি। বরাবর হয়তো তোমার এ ধারণা থাকবে না।

থাকবে দিদি। আমাদের সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে। পুলিশের লোক এসে ভীষণ অশান্তি করছে কিছুদিন ধরে। আমি আর আমার স্বামী একটুও শান্তিতে নেই। দেখা হলে সব বলব।

পুলিশ কেন যে এরকম করছে জানি না। কী লাভ হবে ওদের। শবর দাশগুপ্তই কি এসব করছে?

হ্যাঁ দিদি, উনিই। আপনি চেনেন ওঁকে?

চিনি। আমার বউমার সম্পর্কে দাদা। শবর খুব বুদ্ধিমান।

হ্যাঁ, সেটা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এমন সব প্রশ্ন করেন যে–

বুঝেছি। ওরা ওরকমই। দেখা হলে ওকে আমি বলে দেব।

না, শবরের সঙ্গে দেখা হয়নি শিখার। তিনি ওর কোনও খবর জানেন না, ঠিক কোন দফতরে কাজ করে তাও জানা নেই। দেখা হলে তিনি বলতেন, ওদের আর যন্ত্রণা দিয়ো না। এবার ওদের একটু শান্তিতে থাকতে দাও। পাপ করেছে বটে, কিন্তু তার শাস্তিও তো মেয়েটা কম পায়নি।

এসেছিল গোপালও। সেও বলেছে শবর দাশগুপ্ত তাকে জেরায় জেরায় জেরবার করে ছেড়েছে। এখনও জেরা চলছে। থানায় ডেকে নিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, একজন হুমকি দিচ্ছে। শিখার তাই মন ভাল নেই। শবরকে সে নিরস্ত করতে চায়। এসব করে আর লাভ কী?

দিন চারেক আগে রীণা তার ছেলেকে নিয়ে এসেছিল এক সকালে। ছেলেটার ন্যাড়া মাথা দেখে শিখার বুক জুড়োল। হোক অবৈধ, তবু এই একটা ছেলেই তো বাসুদেবকে স্বীকার করল বাবা বলে!

শিখা তাদের বলেন, খাওয়ালেন। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওঁর কাজ করতে তোমার কোনও কষ্ট হয়নি তো বাবা? অনিচ্ছেয় অভক্তি নিয়ে করোনি তো!

ছেলেটা অকপটে মাথা নেড়ে বলল, না। ওঁর প্রতি আমার তো একটা কর্তব্য ছিল।

ওঁকে তুমি বোধহয় চিনতে! না?

হ্যাঁ। উনি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতেন।

শুনে আমার চোখে জল আসছে। ছেলেমেয়ের প্রতি উনি সারাজীবন তেমন কোনও কর্তব্য করেননি। তোমার সঙ্গে দেখা করতেন শুনে কত ভাল লাগছে! একটু বলবে ওঁর কথা?

অজু লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল। তারপর বলল, আমাকে উনি রেস্তোরাঁয় মাঝে মাঝে খাওয়াতে নিয়ে গেছেন। গল্প করেছেন।

কী গল্প?

অনেক গল্প। বেশিরভাগই ওঁর খেলার জীবনের কথা।

হ্যাঁ, খেলার কথা বলতে খুব ভালবাসতেন। আর আমাদের কথা কখনও বলতেন না?

খুব একটা নয়। তবে দাদারা যে ওঁকে পছন্দ করেন না সেটা বলেছেন।

হ্যাঁ বাবা, ছেলেরা ওঁকে পছন্দ করত না। কারণ ছেলেদের দিকে উনি ফিরেও তাকাননি কখনও। রেগে গেলে এমন মার মারতেন যে ভয়ে আমার রক্ত জল হয়ে যেত। বোধহয় বুড়ো বয়সে পুত্র-ক্ষুধা জেগেছিল। নিজের ছেলেরা হাতছাড়া হওয়ায় তোমার কাছে যেতেন।

অজু চুপ করে রইল।

শুনেছি, তোমাকেও একটা জীবন তোমার বাবার অনাদর সইতে হয়েছে!

ও কিছু নয়। বাবা ভাল লোক।

তা জানি। তোমার ওই বাবার মতো ভাল লোক পৃথিবীতে বেশি নেই। এখন তোমার আসল বাবা তো মারা গেছেন, শঙ্করের সঙ্গে এখনও কি সম্পর্কটা ওরকমই আছে?

অজু একটু হাসল, আপনি ভাবছেন কেন? সব ঠিকই আছে। আমার কোনও অসুবিধে হয় না।

বুঝেছি। এখনও হয়নি। হবেই বা কী করে? ওরও তো কষ্ট কম নয়। আমি এক পাষাণের ঘর করেছি বটে, কিন্তু ভাবতে ভাল লাগছে যে, সেই পাষাণও স্নেহের কাঙাল হয়ে একদিন তোমার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। মনুষ্যত্ব বোধহয় একেই বলে।

আমার বাবা আমার জন্য অনেক করেছেন। তাকে আমার কখনও খারাপ লাগেনি। হি ওয়াজ ভেরি গুড টু মি।

দোহাই বাবা, ইংরেজিতে বোলো না। আমি বুঝতে পারি না। সেকেলে মানুষ তো। বাংলা করে বলল।

উনি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন।

ওঁকে বাবা বলে বলছ। কত ভাল লাগল শুনে!

অজু হাসল, উনি তো আমার বাবাই। বাবা ছাড়া কী বলব?

তাই তো!

রীণা চুপ করে একটা হাতরুমালে চোখ ঢেকে সোফার এক কোণে বসে ছিল। ধীরে জল ভরা চোখ তুলে বলল, আমার বড় পাপের ভয় হচ্ছে। কী যে করলাম জীবনটা নিয়ে।

শিখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসলেন, একটা জ্বালা-পোড়া তো আছেই ভাই। জ্বালা পোড়া ছাড়া কি শুদ্ধ হওয়া যায়? তবে তুমি ভাগ্যবতী, অমন স্বামী পেয়েছ।

রীণা মাথা নেড়ে বলল, শুদ্ধ হওয়া কাকে বলে তাই তো জানি না। এই ছেলেটাকে বুকে আগলে শুধু ভয়ে ভয়ে দিন কেটে গেছে। এখন আর কী হবে শুদ্ধ হয়ে? ছেলের কাছেই তো কিছু গোপন রইল না। ওর চোখে কি আমি আর মায়ের মতো মা?

ওসব ভেবো না। তোমার ছেলে তোমাকে আঁকড়েই তো বেঁচে থেকেছে। জীবনে যেটুকু পেয়েছ তাই নিয়ে থাকো। যা হয়নি তার কথা ভেবে কী হবে? তোমাকে বলি, তোমার স্বামীকে কিন্তু আমি চিনি। সাহস করে একবার তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

রীণা চমকে উঠে বলল, সে কী! কবে?

শিখা একটু হাসলেন। বললেন, তখন আমরা সদ্য এ ফ্ল্যাটে এসেছি। উনি তখন হার্ট অ্যাটাক হয়ে হাসপাতালে।

কেন ডেকে এনেছিলেন দিদি?

মানুষটা একটা জীবন বড় কষ্ট পেয়েছেন। আমার তাই ওঁকে খুব দেখার ইচ্ছে ছিল। তোমার ভয় নেই। শঙ্করবাবু আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছিলেন।

উনি আমাকে বলেননি তো!

বলার মতো ঘটনা নয়। আমি ওঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলাম, দুনিয়ার কোনও পাপেরই শাস্তি বাকি থাকে না। ফল পেতেই হয়। শঙ্করবাবু বড্ড ভাল মানুষ। উনি কেঁদে ফেলেছিলেন। তার পরেও কয়েকবার এসেছেন।

আমাকে কখনও বলেননি তো উনি!

পলিসিটার গতি হল?

হ্যাঁ। ওরা আমাদের ক্লেম অ্যাকসেপ্ট করেছে। প্রসেসিং চলছে। একটু সময় লাগবে।

যাক! ওটা নিয়ে আমার চিন্তা ছিল। তোমার ছেলেটা যে বঞ্চিত হল না এটাই একটা মস্ত সান্ত্বনা।

কিন্তু আপনার ছেলেরা তো খুশি হয়নি দিদি।

শিখা ফের একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার স্বামীর বিষয়সম্পত্তির নেশা ছিল। রোজগার কম করেননি। বাপের টাকা, এই ফ্ল্যাট এসব তো ওরাই পাবে। ওদের অখুশির কারণ দেখি না। তবু যদি খুশি না হয় তা হলে সে ওদের স্বভাবের দোষ। তুমি ওসব নিয়ে ভেবো না। ওদের তো অজুর মতো কষ্টের জীবন নয়। অজুর মানসিক কষ্ট যে অনেক বেশি। ওর জন্য এটুকু করে উনি মনুষ্যত্বেরই পরিচয় দিয়েছিলেন।

আপনি রক্তমাংসের মানুষ নন দিদি। আপনি যেন আকাশ থেকে আলো হয়ে নেমে এসেছেন।

শিখ মৃদু হাসলেন, অত বলতে নেই। পরে যদি ওসব কথা ফেরত নিতে হয়?

কী যে বলেন।

দু'জনেই তাকে প্রণাম করে বিদায় নিয়েছিল। ওই একটা তৃপ্তি পেয়েছিলেন শিখা। কারও ভাগে কম পড়লে তার কষ্ট হয়।

গত কিছুদিনে শিখা ছোটখাটো আরও কয়েকটা তৃপ্তি পেয়েছেন। পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা এসেছিল। সামান্য কিছু টাকা খুব বিনীতভাবে চেয়েছিল তারা। আগের রুদ্রমূর্তি নেই।

শিখা তাদের বললেন, এটুকু আমি পারব। আগে যা চেয়েছিলে তা পারতাম না। আমার যে অত টাকা নেই।

সেই ছেলেরা মাঝে মাঝে তার খোঁজ নিয়ে যায়।

ঢাকুরিয়ার অপোগণ্ডগুলোও আসে। সবাই নয়। যারা একটু চালাকচতুর, যারা একটু সাহসী তারা এসে লিফটে করে আটতলায় ওঠে। বসে সুখদুঃখের কত কথা কয়ে যায়। আজও ওরা তার বন্ধু, তাঁর বড় আপনজন। কাউকে নিজের গয়না বেচে দোকান করে দিয়েছেন, কাউকে পাইয়ে দিয়েছেন ব্যাঙ্ক লোন, একে ওকে কতজনের চাকরি করে দিয়েছেন। রোগে শোকে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। কতটুকু আর পারেন শিখা?

যেটুকু পেরেছেন তাতেই কত লোক কেনা হয়ে আছে তার কাছে।

আজ কি একটু মেঘলা করেছে? শরৎকাল শেষ হয়ে এল। এরপর হেমন্ত। কুয়াশা হবে। একটু একটু করে শীত পড়বে। কতকাল পৃথিবীর এই ঋতুচক্র দেখবেন শিখা?

বাতাসী!

বাতাসী সামনে এসে দাঁড়াল।

ক্লান্ত গলায় শিখা বললেন, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। একটু শোব। আমাকে ডাকিস না। তুই খেয়ে নিস।

তোমার তো রোজ শরীর খারাপ হচ্ছে। ডাক্তারকে খবর দেব?

ডাক্তার জানে। সব জানে। দরকার হলে বলব।

শিখা সামনের ঘর থেকে ভিতরের ঘরে যাবেন বলে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কলিংবেল বাজল। ফের বসে পড়ে বললেন, দেখ তো, কে এল!

বাতাসী দরজা খুলতেই দরজার ফ্রেমে শবর দাশগুপ্তকে দেখা গেল।

মাসিমা, আমি।

এসো বাবা, এসো। তোমার জন্য কতদিন ধরে অপেক্ষা করছি!

শবর ধীর পায়ে ঘরে এল। মুখোমুখি সোফায় বসল। বলল, কেন মাসিমা, আমার জন্য অপেক্ষা করছেন কেন?

তোমাকে বকব বলে। কেন মানুষজনকে ভয় দেখাচ্ছ? এসব করে আর কী লাভ? এবার ওদের একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

শবর মৃদু একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, শুধু এ জন্যই?

হ্যাঁ।

শবর মাথাটা একটু নামিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, আমার কাজটা তত ভাল নয় মাসিমা, কত মানুষের অভিশম্পাত কুড়োতেও হয়। কত প্যাটার্ন, কত ছক, কত সম্পর্ক, কত ভালবাসা অবধি ভেঙে দিতে হয়।

জানি বাপু। কী খাবে বলল। একটু কফি করুক?

ঠিক আছে।

বাতাসীকে ডেকে কফির কথা বলে দিয়ে শিখা শবরের চোখে চোখ রাখলেন, পৃথিবীর সব ছক কি উলটে দিতে পারবে বাবা?

তা বলছি না। আমি আর কতটুকু পারি? পুলিশেরই বা কতটুকু সাধ্য বলুন! পুলিশের ফাইলে কত কেস জমা আছে যেগুলোর মীমাংসা হয়নি। আনসলভড মিস্টরিজ।

ইংরিজি বোলো না। জানোই তো আমি ইংরিজি বুঝি না।

শবর হাসল, বুঝবার দরকারটাই বা কী? ইংরিজি না বুঝেও তো এত কাল চলে গেল।

তা ঠিক। এবার বলল তো, এত তদন্ত করে খেটেখুটে কী হল? কিছু পেলে খুঁজে?

শবর মাথা নেড়ে বলল, না। অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল যার কোনও উত্তর নেই।

যেমন?

শবর মাথা নাড়ল, গোটা ব্যাপারটারই কোনও মানে হয় না। এত মানুষের রাগ ছিল বাসুদেব সেনগুপ্তর ওপর, অথচ কাউকেই আমার হত্যাকারী বলে কেন মনে হচ্ছে না বলুন তো। অ্যালিবাই নেই, তবু কেন ক্র্যাকডাউন করা যাচ্ছে না? মাসিমা, পুলিশের চাকরি করতে করতে একটা জিনিস হয়, অন্তত আমার হয়, অপরাধীর মুখোমুখি হলে ভিতরে যেন একটা কিছু টিকটিক করে। এবার তা হল না। কেন মাসিমা?

আমি তার কী জানি বাবা?

বাতাসী কফি নিয়ে এল। শবর একটা চুমুক দিয়ে শিখার দিকে তাকাল। শিখার মুখে একটু দুষ্টু হাসি। চোখে একটু চিকিমিকি।

শিখা হঠাৎ বাতাসীকে ডেকে বললেন, এই মুখপুড়ি, আমি নিরামিষ পিন্ডি গিলছি বলে তুইও কি মাছ খাওয়া ছাড়লি নাকি?

বাতাসী একটু অবাক হয়ে বলে, আমার মাছ লাগে নাকি?

লাগবে না কেন? লাগালেই লাগে। যা গিয়ে বাজার থেকে একটু মাছ নিয়ে এসে ভাল করে বেঁধে খা।

কী যে বলো তার ঠিক নেই।

শোন মা, আমি ভোররাতে স্বপ্ন দেখেছি, তুই আমার সামনে বসে মাছ-ভাত খাচ্ছিস। এসব স্বপ্ন কিন্তু সাংঘাতিক। যা মা একটু মাছ নিয়ে আয়। গড়িয়াহাটে যা, ওই সঙ্গে আমার ওষুধও নিয়ে আসিস। শোয়ার ঘরে প্রেসক্রিপশনটা আছে। নিয়ে যা।

বাতাসী একটু সময় নিল। মিনিট দশেক বাদে সে একটু ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর শিখা বললেন, এবার বলল বাবা।

শবর মৃদু মৃদু হেসে বলল, কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

তুমি আমাকে জেরা করবে না?

না। শুধু একটা কথা।

বলো।

তেরো তারিখে সন্ধেবেলা বাতাসী কোথায় ছিল?

বাঃ, এই তো জেরা করেছ। বাতাসীকে সেদিন আমি ছুটি দিয়েছিলাম। সেদিন সকালেই ও ওর বাড়ি গোসাবায় গিয়েছিল। চোদ্দো তারিখে ফিরে আসে।

ওঃ।

আর কিছু?

না মাসিমা।

কেন ছুটি দিয়েছিলাম জানতে চাইলে না?

না।

কেন জানতে চাও না?

প্রয়োজন নেই বলে।

তেরো তারিখে দুটো লোক লিফট সারানোর নাম করে লিফটটা আটকে রেখেছিল। তাদের কি খুঁজে পেয়েছ?

না মাসিমা। মনে হয় তাদেরও খোঁজার আর দরকার নেই।

শিখা একটু পিছনে হেলে চোখ বুজে রইলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, তুমি কি তদন্ত থেকে সরে দাঁড়াচ্ছ শবর?

হ্যাঁ মাসিমা।

ভাল। মানুষকে আর কষ্ট দিয়ো না। মানুষের এমনিতেই কত কষ্ট!

ঠিক কথা। আমি সেই কষ্টের কথা শুনতেই আজ আপনার কাছে এসেছি।

ক্লান্ত শিখা, শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণায় কাতর শিখা আধবোজা চোখে শবরকে দেখছিলেন। তারপর ধীরস্বরে বললেন, জানো, আমার প্রথম ছেলে অর্ক কীভাবে হয়? উনি বাইরে কোথায় খেলে সেদিন সন্ধেবেলাতে ফিরলেন। আমার তখন পেইন শুরু হয়েছে। ওঁকে বললাম। উনি বললেন, আমার একটা ফাংশন আছে, যেতেই হবে। তুমি পাড়ার কাউকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যাও। উনি বেরিয়ে গেলেন। আমি একা অভিমান নিয়ে বসে রইলাম। কিন্তু অভিমান কার ওপর বলো! ব্যথা বেড়ে যাচ্ছিল। শেষে নিজেই একটা রিকশা নিয়ে একা হাসপাতালে যাই। ভরতি হই। ছেলেও হয়। ছেলে হওয়ার আনন্দ সেদিন আর কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারিনি। এ কি কষ্টের কাহিনি শবর?

সরি মাসিমা। আপনি সত্যিই সাফার করেছেন।

ও কথা বোলো না। সব কষ্টই মানুষ হাসিমুখে সইতে পারে যদি তা ভালবাসার জনের জন্য হয়। কষ্টকে তখন কষ্ট বলেই মনে হয় না। আর ভালবাসার জন্য যদি না হয় তা হলে ছুঁচটা তুলতেও যেন পাহাড় তোলার পরিশ্রম।

শবর মাথা নিচু করে রইল।

আমার ছেলেরা ভাগভিন্ন হয়ে গেছে, মেয়েও বড় একটা এমুখো হয় না। তারাও তো কিছু কম কষ্ট পায়নি। কষ্ট পাচ্ছিল শঙ্কর বসু, রীণা, আমার ভাশুর আর ভাশুরপোরা। আমি জানতাম এসব দুঃখ কষ্ট সহজে দূর করা যাবে না। আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমার সাধ্য কী বলল তো! অন্যায়ভাবে ঢাকুরিয়ার বাড়িটা উনি দখল করেছিলেন, অন্যায়ভাবে তা প্রমোটারকে দিয়েছিলেন।

জানি মাসিমা।

আমি ওঁকে কতবার বলেছি, এভাবে বঞ্চিত করতে নেই, তাতে ভাল হয় না। উনি তো আমার কথাকে কখনও মূল্য দেননি।

শঙ্কর বসুর কথা বলুন।

হ্যাঁ। সে বেচারাকে যখন ডেকে আনালাম তখন দেখল ম একটা জীবন স্ত্রীকে রাহুর গ্রাসে সমর্পণ করে লোকটা ভিতরে ভিতরে কেমন ক্ষয়ে গেছে। অত বড় চাকরি, অত টাকাপয়সা, কিন্তু মুখখানা যেন শোকাতাপা। বড় কষ্ট হয়েছিল মানুষটার জন্য। আর অজু! শঙ্করবাবুর কথা থেকে জেনেছিলাম, অজুকে তিনি কিছুই দেবেন না। ছেলেটার জন্য আমার চিন্তা হয়েছিল। একটা পলিসির নমিনি ছেলেটাকে করা হয়েছিল বটে, কিন্তু ওরকম খ্যাপা মানুষের তো মতিস্থিরতা ছিল না। কবে রেগে গিয়ে নমিনি বদলে দেবেন। তা ছাড়া ম্যাচুরিটিরও তো দেরি ছিল। ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটটা নিয়েও ওই একই কথা। হয়তো কখনও সিদ্ধান্ত বদল করে ফ্ল্যাটটা বেচেই দিলেন কাউকে। ওঁর তো রাগের কোনও ঠিকঠিকানা ছিল না।

আর তাই–?

শিখা একটু চুপ করে রইলেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছিল। মৃদু স্খলিত কণ্ঠে বললেন, ওঁর চলে যাওয়ার দরকার ছিল হয়তো। গিয়ে ভালই হয়েছে। কী বলো?

আমি কী বলব মাসিমা, আপনি বলুন।

শিখা উঠে ভিতরের ঘরে গেলেন। ফিরে এলেন একগাদা মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে। শবরের সামনে সেন্টার টেবিলের ওপর সেগুলো রেখে বললেন, দেখো। উলটেপালটে দেখো।

শবর ভ্রূ কুঁচকে বলল, এ তো আপনার মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখছি।

হ্যাঁ, প্রায় ছ'মাস আগে অসুখটা ধরা পড়ে। ডাক্তার জানে আর আমি। আর কাউকে জানাইনি। ওঁকে বা ছেলেমেয়েকে কখনও বলিনি।

কেন মাসিমা? এ তো টারমিনাল ডিজিজ।

ও কথাটা ডাক্তারদের মুখে অনেকবার শুনেছি, তাই মানে জানি। হ্যাঁ বাবা, মারক অসুখ।

চিকিৎসা?

শিখা হাসলেন, ক্যান্সারের আর কী চিকিৎসা বাবা? কেমোথেরাপি না কী ছাইভস্ম করতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। ওসব করে কী লাভ বলো? মরতে যে আমার একটুও অসাধ নেই।

শবর রিপোর্টগুলোয় চোখ বুলিয়ে রেখে দিল।

রোগটা হওয়ার পর বুঝেছিলাম, আমি যদি ওঁর আগে যাই তা হলে অনেক সমস্যার আর সমাধান হবে না। অনেক মানুষের বুকে জ্বালাপোড়া রয়ে যাবে। থেকে যাবে অনেক অনিশ্চয়তা। বুঝেছ?

হ্যাঁ মাসিমা। সব কিছুই মিলে যাচ্ছে।

মিলবেই তো। সবকিছু মিলে যাবে। যে দুটো লোক লিফট সারাবার অছিলায় এসেছিল তুমি তাদের জন্মেও খুঁজে পাবে না। আর যদি পেয়েও যাও, ওদের গলা কেটে ফেললেও কথা বের করতে পারবে না।

বুঝেছি।

আর সেই লোক দুটোর নাম বা পরিচয় আমার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে, এ মুখ দিয়ে তা বেরোবে না কখনও।

আমি জানি, বুলডগের মতো অনুগত আপনার কিছু লোক আছে, যারা আপনার জন্য প্রাণ দিতে পারে।

হ্যাঁ বাবা। আমার নিঃসঙ্গ জীবনে এইসব লোকই তো আমাকে সঙ্গ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। নিরন্ন, দুঃখী, জর্জর সব মানুষ যাদের ভালর জন্য আমি সামান্য সামর্থ্যে যতটুকু পারি করেছি।

শিখা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর চোখের অবাধ্য ধারা আঁচলে মুছবার একটা অক্ষম চেষ্টা করে বললেন, ওদের খোঁজ ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছ শবর। ওরা কী করেছে তা ওরা ভাল করে জানেই না। ওরা শুধু আমার হুকুম তামিল করে চলে গেছে।

বুঝেছি মাসিমা।

তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। খুবই বুদ্ধিমান। জীবনে খুব উন্নতি করবে বাবা।

কেন লজ্জা দিচ্ছেন মাসিমা। আমি আজ এসব কথা শুনতে তো আসিনি।

শিখা নিমীলিত চোখে তার দিকে চেয়ে গভীর হাহাকারের মতো একটা শ্বাস ছাড়লেন। সেই শ্বাসে কান্নার কম্পন ছিল। শিখা প্রকাশ্যেই চোখের জলে ভেসে যাচ্ছেন। একটু চুপ করে থেকে দূরাগত গলায় বললেন, কী শুনতে চাও শবর?

আপনি বলতে না চাইলে–

কান্নার মধ্যেও শিখা সামান্য একটু হাসলেন। অদ্ভুত দেখাল তখন মুখখানা।

প্রায় ফিসফিস করে বললেন, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আমি সিঁড়িতে ওঁর চটির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। নির্জন ফাঁকা বাড়ি, সব শব্দই পাওয়া যায়। একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে তিনতলা... উনি ধীরে ধীরে উঠে আসছেন। উনি উঠছেন আর বুকের মধ্যে ওঁর পায়ের শব্দ যেন দুম দুম করে ধাক্কা মারছে। এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল, চিৎকার করে বলি, ওগো! উঠো না উঠো না! এ সবই আমার ষড়যন্ত্র! আমি এক্ষুনি নেমে গিয়ে লিফট চালু করছি।... নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজেকে সামলেছি। নিজেকেও বলেছি, একটুক্ষণের জন্য পাষাণী হ... এই একটা পাপ মাথায় নে, তাতে অনেক পাপের স্খলন

হবে। ও দোতলা থেকে তিনতলা উঠল... চারতলা... কার সঙ্গে যেন হাঁফধরা গলায় কথা বলল... তারপর তিনতলা পেরিয়ে চারতলা... পায়ের শব্দ অনেক শ্লথ হয়ে গেল। বুঝতে পারছিলাম সে টান ধরছে। আর পারছে না। কিন্তু জেদি, অহংকারী মানুষ। ছাড়বেও না। পাঁচতলা পেরিয়ে ছ'তলায় উঠতে যেন যুগ পেরিয়ে যাচ্ছিল। পারছে না। কিছুতেই পারছে না। আমি আটতলার চাতালে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেসে যাচ্ছি। চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছিল। এত জোরে দাতে দাঁত চেপে ধরেছিলাম যে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। রেলিং চেপে ধরেছি প্রাণপণে। আর ওদিকে ও উঠছে! কী ক্লান্ত পায়ের শব্দ। কী ভয়ংকর শ্বাসের শব্দ! পাঁচতলা থেকে ছ'তলা কতদূর শবর? কিন্তু সে যেন ওঁর কাছে এক অফুরান পথ। উঠছেন তো উঠছেনই। শেষ অবধি পৌঁছোলেন ছ'তলায়। থামলেন। হঠাৎ শুনলাম ডোরবেল বাজছে। একবার, দু'বার, তিনবার। তারপরই একটা শব্দ। উনি পড়ে গেলেন। তখনই শুনলাম, হাঁফধরা গলায় উনি প্রাণপণে আমাকে ডাকছেন। আমাকেই! শিখা... শিখা... শিখা....! অমনভাবে কতকাল ডাকেননি!

মাসিমা! আপনি চুপ করুন! আপনি বড় ভেঙে পড়ছেন!

বাবা, না। বলতে দাও। নিজের মুখে সব বলতে দাও আমাকে।

প্লিজ মাসিমা।

না শবর, আজই তো আমার পরীক্ষা। শোনো, মন দিয়ে শোনো।

বলুন শুনছি।

ওঁর ওই প্রাণঘাতী ডাক এখনও আমার কানে লেগে আছে। শিখা... শিখা... শিখা...! ওই ডাক শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারিনি। আসছি গো, আসছি' বলে চিৎকার করলাম, গলা দিয়ে স্বরই বেরোল না। দৌড়ে নেমে গেলাম ছ'তলায়। উনি সিঁড়ির গোড়াতেই পড়ে ছিলেন। মুখ টকটক করছে লাল। হাঁফ ধরে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হাঁ করে প্রাণপণে

শাস টানার চেষ্টা করছেন। ঘোলাটে চোখ। আমাকে দেখে একটা অসহায় হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাতটা নেতিয়ে পড়ে গেল।

শিখা একটু থামলেন। কাঁদতে কাঁদতে তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে রইলেন। তারপর আঁচলটা সরিয়ে খুব ধীর গলায় বললেন, আমি কী করলাম জানো?

বলুন মাসিমা।

আমি ওঁর পায়ের কাছে বসে, দু'খানা পা বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ছাড়ো, এই পাপ-দেহ ছেড়ে যাও। ওগো, মুক্ত হও, মোচন করো পার্থিব বন্ধন। দেহের দাস, কর্মফলে ক্লেদাক্ত মন জীর্ণ বসনের মতো ফেলে যাও বিমুক্ত আত্মা। নীড় ছাড়ো অনিকেত, দেহ ছাড়ো অশরীরী, মায়া ছাড়ো মোহাতীত। চোখের জলে ভেসে সেই আমার শেষ পুজো তাকে। ধীরে ধীরে শরীরের সব কম্পন থেমে গেল। আমি ওঁকে প্রণাম করে উঠে এলাম। তারপর ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওঁর মৃত্যুসংবাদের জন্য।

ঘরে অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এল। কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। শিখা অনেকক্ষণ আঁচলে মুখে ঢেকে রইলেন। তারপর ধীরে মুখের ঢাকনাটা সরিয়ে একটু হাসলেনও, তোমাদের পেনাল কোড আমাকে আর কী সাজা দিতে পারে শবর?

শবর একটু হাসল।

শিখা মৃদুস্বরে বললেন, সাজা কাকে বলে তা কি জানো শবর? জানো জ্বালা? জানো গ্লানি?

শবর উঠে দাঁড়াল। মৃদুস্বরে বলল, আসি মাসিমা।

এসো বাবা।

শবর দরজাটা খুলে বাইরে পা দিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল। যেন নিজের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে আছেন শিখা।

শবর দরজাটা খুব সাবধানে বন্ধ করে দিল। তারপর ধীর পায়ে লিফটের দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আনমনে নামতে লাগল।